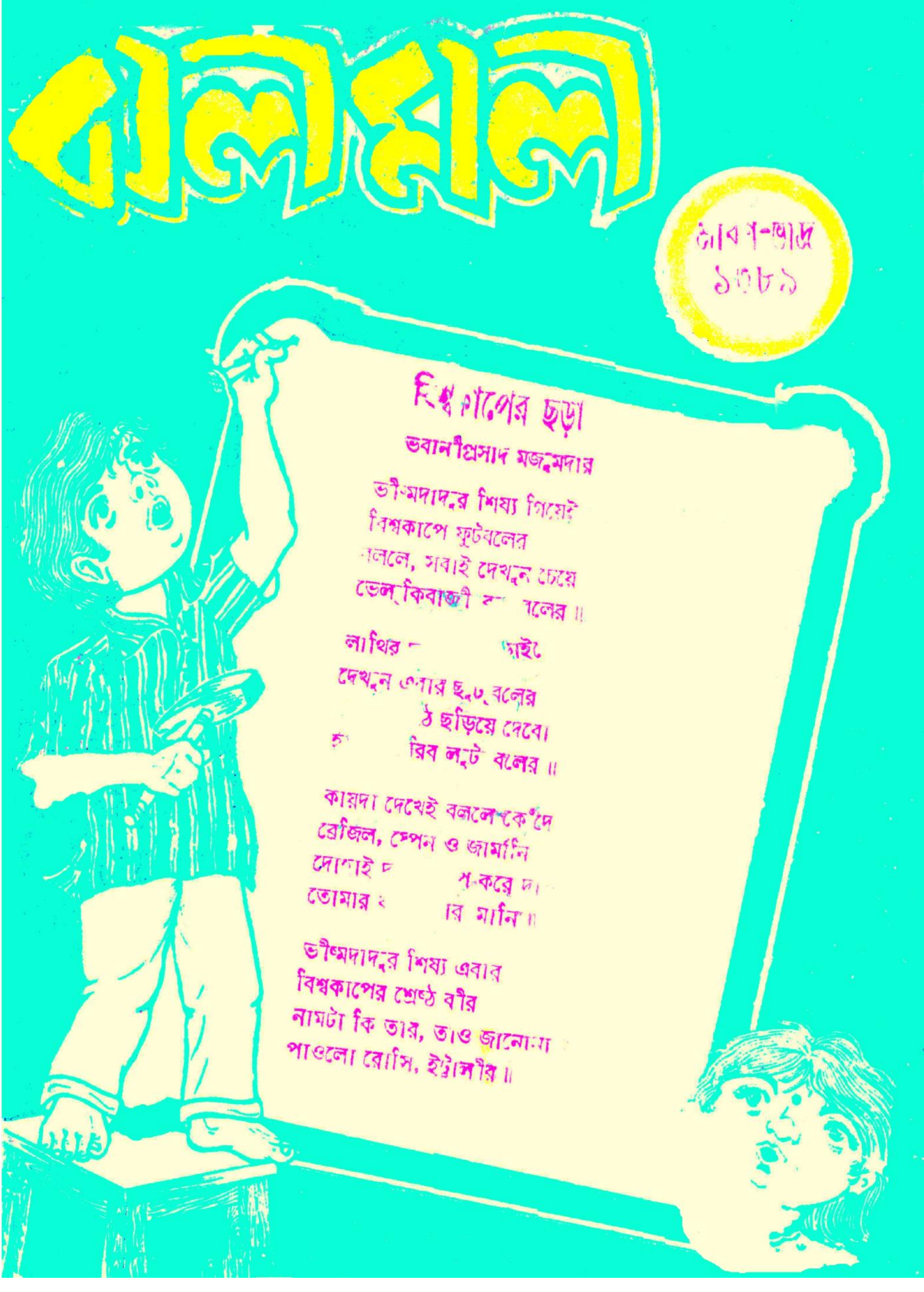

শ্রাবণ-ভাদ্র
১৩৮৯
বিশ্বকাপের ছড়া
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
ভীষ্মদাদুর শিষ্য গিয়েই
বিশ্বকাপে ফুটবলের
ললে, সবাই দেখুন চেয়ে
ভেলকিবাজী বলের ॥
লাথির গাইে
দেখুন এবার ছু বলের
ঠ ছড়িয়ে দেবে।
রিব লুট বলের ॥
কায়দা দেখেই বললে কেঁদে
ব্রেজিল, স্পেন ও জার্মানি
দোহাই প করে দা
তোমার র মানি ॥
ভীষ্মদাদুর শিষ্য এবার
বিশ্বকাপের শ্রেষ্ঠ বীর
নামটা কি তার, তাও জানো না
পাওলো রোসি, ইটালীর ॥



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

ঝলমলের নিয়মাবলী

(১) ঝলমল-এর এক বছরের গ্রাহক চাঁদা কমিয়ে ২৪ টাকা করা হল। শারদ ঝলমল বা বিশেষ সংখ্যার জন্য আলাদা কোনো টাকা দিতে হবে না। শারদী সংখ্যার আনুমানিক মূল্য বারো টাকা। শারদীয়া সংখ্যা রেজঃ ডাকে যাবে।

(২) যে কোনো সময় চাঁদা দিয়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

(৩) বাংলা মাসের প্রথম অর্থাৎ ইংরাজী মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঝল প্রকাশিত হয়।

(৪) গ্রাহকরা সময় মতো বই না পে দপ্তরে জানালে ডুপ্লিকেট কপি দেও হয়।

গ্রাহক চাঁদা মনিঅর্ডারে এবং নগদে পাঠান যায়। এছা তবে কলকাতার কোন ব্যাংকের উপর পাঠাতে হবে। 'Jhalm পাঠাবেন।

হক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর বিভিন্ন বিভাগে লেখা ও ছ ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম, ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখে ব্যা চাইলে জোড়া পোস্টকার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা যথাসম্ভব ছো পাঠাবেন। স্বনামাঙ্কিত পোস্ট দিলে ফলাফল জানানো হবে। নকল রেখে লেখা পাঠাবেন। অমনোন লেখা ফেরত দেওয়া হবে না কোন মাসে পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়।

(৮) মজার ধাঁধা, হাতে খড়ি, ছবি দেখে গল্প, প্রকৃতির আঙ্গিনায়, চিঠিপ মফস্বলের টুকিটাকি খেলাধুলা প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিভাগে লেখা বা জানতে চাইলে আলাদা আলাদা কাগজে বিভাগের নাম স্পষ্ট করে লিখে পাঠ হবে।

এজেন্টদের জন্য নিয়মাবলী

(১) কমপক্ষে ১০ কপি পত্রিকা নিতে হবে।

(২) দশ টাকা জমা রাখতে হবে।

(৩) V. P. P. ত্রিক যাবে—ডাক খরচ আমরা বহন করব।

(৪) ২৫% কমি

(৫) বাতিল করা হবে এবং জমা টাকা দেওয়া হবে

এ সংখ্যায়

খেলাধুলার আসর

(এবারের এই আসরটিকে বিশ্বকাপের বিশেষ আসর করা হয়েছে)

প্রচ্ছদ ঃ স্বপন রায় চৌধুরী

সম্পাদক ঃ অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য

সহ সম্পাদক ঃ পীযূষ রায়

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE, NO. 443/16 (2) T.B.C. (Dated 4th December, 1979)

সম্পাদকীয় কার্যালয়

১, রাজেন্দ্র দেব রোড (ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে) । কলিকাতা-৭০০ ০০৭ ।

ফোন—৩৪-৭৮০৩

শ্রীসিতাংশুশেখর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রগতি প্রিণ্টার্স, ৭৫, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত এবং পি-৪৬, নজরুল ইসলাম অ্যাভনিউ, কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ হইতে প্রকাশিত।

মূল্য—দু টাকা মাত্র।



[এ মাসের সেরা চিঠি]

বৃষ্টি কোথায়

দাদাভাই,

বৃষ্টি হচ্ছে না কেন? আষাঢ় শ্রাবণ নাকি বর্ষাকাল। তবে বৃষ্টি হচ্ছে না কেন? এদিককার মাঠ খাল বিল শুকিয়ে গেল; চাষীদের মাথায় হাত পড়েছে। কি হবে?

ইতি—মাষ্টার (১০) নবগ্রাম

বিজ্ঞান প্রবন্ধ দরকার

সম্পাদক সমীপেষু,

মহাশয়, আপনাদের প্রকাশিত সবার প্রিয় 'ঝলমলে' বিজ্ঞানভিত্তিক প্রবন্ধ সৌরজগতের দশম গ্রহের জন্য নারায়ণ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ। এ ধরনের প্রবন্ধের আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আশাকরি প্রতি সংখ্যায় এধরণের প্রবন্ধ দিয়ে ঝলমলকে আরো ঝলমল করে তুলবেন। ইতি—সমীর

একঘেঁয়েমি দূর হোক

দাদাভাই,

রেডিওতে প্রত্যেকদিন তিনটে বড় টিমের খেলা ছাড়া অন্য সব খেলা বিরস মনে হয়। প্রায় সব খেলাই তো একচেটিয়া। অন্য সব খেলাই তো জানা কথা—বড় তিন দলের বিরুদ্ধে ছোট দল হারবে। ব্যতিক্রম, দু'একটা।

এই কারনেই বলছিলাম, ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান এর মহামেডানের নামকরা প্লেয়াররা যদি ছড়িয়েছিটিয়ে অন্যান্য দলে থাকেন তাহলে খেলার মান আরও উন্নত হতে পারে। আশাকরি তোমার মাধ্যমে আমার অনুরোধ ক্লাব কর্মকর্তারা ভাববেন।

ইতি—সুমন জানা (১২) কণ্টাই।

দারুণ

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,

নতুন সাজের ঝলমল দেখে খুব ভালো লাগল। বেশ হয়েছে দেখতে। চিঠি পত্তর, মফসবলের টুকিটাকি, বিভাগ দুটি বেশ আকর্ষনীয়। 'বলতো' আমার খুব ভালো লাগে।

আষাঢ় সংখ্যায় গল্প ছড়া গুলি খুব ভালো লেগেছে। ড্রাগন পাহাড়ের রহস্যের শেষাংশটুকু পড়ার জন্য ছটফট করছি। সঞ্জীববাবুর প্রচ্ছদ ছড়াটিও দারুন।

ওহো, মাম্পির কাকুর কথামত দারুণ তো বলা চলবে না। ইতি—

শিল্পী বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাসত।

কভারে কমিকস চাই

শ্রদ্ধেয় দাদাভাই,

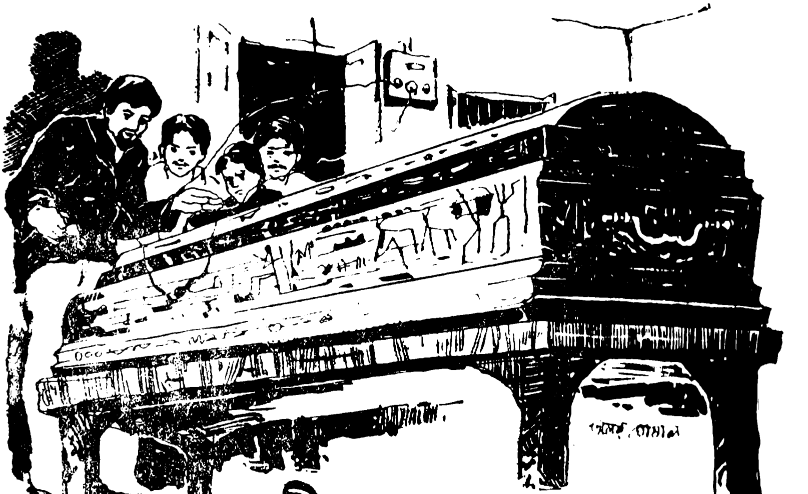
সর্বপ্রথমে আপনি আমার প্রণাম জানাবেন। চিঠিপত্তর বিভাগ আমার খুব ভালো লেগেছে। ঝলমল সমন্ধে কয়েকটি কথা আমি বলব, যা আগেও দু তিনবার 'ঝলমল'-এ চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম। 'ঝলমল-এ' যদি প্রচ্ছদে কোন কমিকস্ থাকে তবে ঝলমল আরো ঝলমলিয়ে উঠবে। এ বিষয়ে এবার এগুলে আমাকে জানাবেন। ইতি—জয়দীপ (১৩) ব্যান্ডেল

লম্বু জাম্বু

ইন্দ্রনীল ঘোষ




খেয়েছে! লোকটা ছুটে আসছে!
খুন পী যাউঙ্গা তেরা!!
অ্যাঁক!
হোদল জোঁহু!
দুম!
না:! সবাই ধরতে আসছে! পেছনে জাম্বুটাও রয়েছে! কেটে পড়ি!
প্যাঁক! প্যাঁক!
হু-শ্-শ্-শ্-শ্-
দুড়ুম!
ক্যাঁচ-ক্যাঁচ!
একদফে উতার! এইসা মার মারুঙ্গা কী জীন্দেগীভর ইয়াদ রহেগা!
একসময় আমি বক্সিং-করতাম! নেমে আয় তোর ওপর একটু হাতের সুখ করি!
হতচ্ছাড়া! দেখে চলতে পারিস না?!
!?
লম্বু! সাইকেলের দাম দে বলে দিচ্ছি!
ইন্দ্র



ম্যামীর সঙ্গে গল্প সল্প

সন্ধেবেলা সভা সেরে ফিরলাম। খুব খাটাখাটুনি গেছে। তাই বাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়লাম। সবে নাকডাকা শুরু হয়েছে এমন সময় দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠলো।

আমি উঠবো উঠবো করছি ; ইতিমধ্যে গিন্নী হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। বললেন—"ডাক্তার পনেনার এই চিঠি পাঠিয়েছেন।" ডাক্তার পনেনার আমার খুব পুরোনো বন্ধু। লিখেছেন, "তাড়াতাড়ি চলে আয়। এতদিন পরে আজ ম্যামিটা পরীক্ষা করার অনুমতি পেয়েছি যাদুঘরের কাছ থেকে। ওটা বাড়িতে আনা হয়েছে। তোরা বিশেষ ক'জন ছাড়া আর কারুকে ডাকছি না। আজ রাত এগারটায় ঠিক এসে যাস।"

চিঠিটা পড়েই আমার ঘুমটুম কোথায় উবে গেল। হুড়মুড় করে উঠে দু মিনিটে জামাকাপড় পরে ডাক্তারের বাড়ি রওনা হলাম।

ওখানে পৌঁছে দেখি ওরা সবাই আমার জন্য ছটফট করছে। খাওয়ার ঘরের টেবিলে ম্যামিটা রাখা রয়েছে। আমি ঢুকতেই ওরা বলে উঠলো—"এসে গেছে, এসে গেছে। এবার কাজ শুরু হোক।"

ম্যামিটা বছর আষ্টেক আগে ডাক্তারের ভাই লিবিয়া পাহাড়ের কবরগুহা থেকে এনেছিলেন। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম ঐ গুহাটা নাকি নানারকম সুন্দর মূর্তি, ফুলদানি ছবি দিয়ে সাজানো ছিল। ওখান থেকে ম্যামিটা পেয়ে উনি ওটাকে যাদুঘরে জমা দিয়েছিলেন। গত আট বছর ধরে ওটা যাদুঘরে বাক্সসুদ্ধুই সাজানো ছিল। আমাদের এখানে ম্যামিটা বাক্সসুদ্ধুই এসেছে।

আমি টেবিলের সামনে এসে দেখি সাত ফুট লম্বা আর তিন ফুট চওড়া একটা কাঠের বাক্সে ম্যামিটা রয়েছে। দেখে খুব ভালো কাঠ বলে মনে হয়। তার

উপর নানারকমের রং দিয়ে নক্সা করা আর পুরোন মিশরী হরফে অনেক কি সব লেখা। আমাদের আরো দুজন বন্ধু ওখানে ছিলেন। তাঁরা আবার মিশরের বিষয়ে খুব জানেন। ওদের ভাষাও পড়তে পারেন। ওঁরা পড়ে বললেন বাক্সের উপর মিশরী পুরাণের গল্প লেখা আছে। আর লেখা আছে ম্যমির নাম। ম্যমির নাম হলো কাউন্ট আললামিসটাকিও। খুব বড়ো পরিবারের ছেলে।

বাক্স পুরো বন্ধ ছিল। কাটতে গিয়ে দেখা গেল বাক্সটা আসলে প্যাপিরাসের মন্ড দিয়ে তৈরী। তার ভেতর আরো একটা বাক্স। সেই বাক্সটা আবার কফিনের মতো দেখতে। তার উপরেও নানান কারুকার্য করা নানান রংএ। সেটাও প্যাপিরাসমন্ড দিয়ে তৈরী। সেটা কেটে একটা আসল সিডার কাঠের কফিন বের হলো। তার উপর চমৎকার কাজ করা। তবে এটা ছোট—মানুষের মাপের।

এই তৃতীয় বাক্সটা কেটে ম্যমিটা বার করা হলো। ম্যমিটার গায়ে প্যাপিরাসের চাদর জড়ানো। আর সেই চাদরে সোনালি অক্ষরে কত কি লেখা। মিস্টার গ্লিডন আর মিস্টার বাকিংহাম, আমাদের মিশরী জানা বন্ধুরা পড়ে বললেন এতে ঐ লোকটার নাম, বংশপরিচয়, কাজের বিষয়, তাঁর গুণাবলী সব লেখা রয়েছে। তিনি যা যা করেছেন সেগুলো নানা রংএ আঁকা আছে। দেহটার গলায় মোটা পুঁতির মালা। পুঁতিগুলোতে আবার নানান দেবদেবীর মূর্তি আঁকা। কোমরে আবার ঐ রকমের কাঁচের পুঁতির মোটা বেল্ট।

প্যাপিরাসের চাদর খুলে ফেলতেই আমরা দেখলাম একটা খুব সুন্দর আর লাল চেহারা। দাঁত আর চুল খুব ভালো। খালি চোখটা দেখলে মনে হয় পাথরের চোখ। আঙুল নখ সব সোনালি রং করা।

আমরা দেহটা শুইয়ে কোথায় কাটাকুটি আছে, খুঁজছি। সুন্দর আস্ত চেহারা, কোথাও কোনো কাটাকুটির চিহ্ন নেই। উলটে পালটে দেখা হোল। এইসব করতে করতে রাত দুটো বেজে গেল। তখন ঠিক হল আবার কাল সকালে দেখা হবে।

এমন সময় এক বন্ধু বললেন—চলো না একটু ইলেকট্রিক শক্ দিয়ে দেখা যাক।

অন্তত চার হাজার বছরের পুরোন একজন মানুষের মৃতদেহে ইলেকট্রিক শক লাগানোর কথায় আমরা সবাই বেশ নেচে উঠলাম। একটু মজা করার জন্যই মিশরীর কপালে এক জায়গায় একটু কেটে তার জড়ানো হলো। ব্যাটারিতে প্লাগ লাগিয়ে অনেকবার শক দেওয়া হলো। কিন্তু কিছু হলো না। দেহটা যেমন অনড় ছিল তেমনই রইল।

আমরা নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে হাসাহাসি করে বিদায় নিচ্ছি এমন সময়ে আমার চোখ পড়লো ম্যমির চোখের উপরে। দেখি সেই পাথরের মতো চোখে পলক পড়ছে।

ডেকে সবাইকে দেখালাম। ডাক্তার আর গ্লিডন তো ভয়ে সিঁটিয়ে গেল আর বাকিংহাম সাহেব ঢুকলেন টেবিলের

রেখা নাগ

তলায়। আমারও খুব ভয় করছিল। সবাই আমরা কাঁপছি ঠক্‌ঠক্‌ করে।

খানিক পরে যখন আর কিছু হলো না ভয়টা একটু কমলো। তখন ঠিক হলো আরো কয়েকবার শক দিয়ে দেখা যাক। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে এবার কাটা হলো। তাতে তার জড়িয়ে বিদ্যুৎ চালাতেই হঠাৎ জীবন্ত মানুষের মতো হাঁটু দুমড়ে এক লাথি চালালো ম্যমি। ডাক্তার ম্যমির পায়ের কাছে ছিল। লাথি-তে ছিটকে জানালা দিয়ে সোজা রাস্তায়।

আমরা তাড়াতাড়ি ছুটলাম ওকে তুলে নিয়ে আসতে। দেখি নিজেই উঠে ছুটতে ছুটতে আসছে। ঘরে ঢুকেই বললে, "এবার তাহলে নাকে শক দেওয়া যাক।" যেই কথা সেই কাজ।

নাকের ডগায় কেটে তার ঢুকিয়ে শক দেওয়া হলো। তারপর যা হলো অদ্ভুত কাণ্ড। শুনে অবাক হবেই।

ম্যমিটা চোখ খুললো প্রথমে। তারপর চোখ টিপে ইসারা করলো। তারপর হাঁচলো। হেঁচেই টপ করে উঠে বসলো। বসে ডাক্তারের দিকে ঘুঁসি দেখাতে লাগলো। তারপর গ্লিডন আর বাকিং-হামকে মিশরী ভাষায় বকতে লাগলো ঃ—

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ কি ব্যবহার আপনা-দের। আমার খুব খারাপ লাগছে। আপনাদের জন্য খুবই লজ্জা পাচ্ছি আমি। ডাক্তার না হয় কিছু জানেন না। কিন্তু আপনারা দুজনে তো মিশরের আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব জানেন ভালো মতোই। তবে আমার দুর্গতি করছেন কেন? ডাক্তার একবার আমার কপাল এক-বার আমার পা আবার আমার নাক নিয়ে টানাটানি করছেন—আর আপনারাও তাই করছেন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এই ঠাণ্ডায় আমার প্যাপিরাসের খোলস ছাড়িয়ে তিন প্রস্থ কফিন থেকে বার করে জোর করে বাঁচিয়ে তোলা? এটা কি আপনাদের উচিত কাজ হলো, বলুন?"

ম্যমির কথা শুনে আমরা লজ্জায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি আর ডাক্তার অবশ্য কিছুই বুঝিনি। গ্লিডন আর বাকিংহাম আমাদের অনুবাদ করে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর ওরা দুজন আমাদের সকলের তরফ থেকে বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করলেন আর মাফ চাইলেন। নানা ভাবে ম্যমিকে এটা বোঝানো হলো বিজ্ঞানের তথ্য জানার জন্যই তাঁকে নিয়ে এত টানাটানি এত কষ্ট দেওয়া। মনে হলো আললামিসটাকিও মশাই কথা-গুলো বুঝতে পেরেছেন। কেন না, হঠাৎ টেবিল থেকে নেমে এসে উনি একে একে আমাদের সকলের সঙ্গে হাত মেলালেন।

তারপর আমরা তাড়াতাড়ি ওঁর কপালের কাটা সেলাই করে নাকে স্টিকিং প্লাস্টার লাগিয়ে পায়ের আঙুলে ব্যাণ্ডেজ করে দিলাম। কাউণ্ট শীতে কাঁপছিলেন। ডাক্তার তাড়াতাড়ি নিজের আলমারি



ঘেঁটে একজোড়া প্যাণ্ট-সার্ট আর সোয়েটার, কোট, মোজা, জুতো, টুপি, ছড়ি, চশমা জোগাড় করে আনলেন। একটু আঁটো একটু ছোট হলো ঠিকই তবে টেনেটুনে কাউণ্টকে ঐসব জামা কাপড় পরানো হলো। তারপর সবাই মিলে আগুনের ধারে আড্ডা দিতে বসা হলো। কফি এলো সিগারেট এলো।

নানা বিষয়ে কথা চলতে লাগলো। কথায় কথায় আমরা বুঝলাম প্রাচীন মিশরীরা খুব উন্নত ছিল—ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজব্যবস্থা, সব ব্যাপারেই তারা আজ-কালকার মতোই বা আরো ভালো ছিল।

কাউণ্ট বললেন "আমাকে ওরা সাতশ বছর বয়েসে ম্যমি করে দিয়েছিল জীবন্ত অবস্থায়। তাই আপনারা আমায় বাঁচাতে পারলেন।"

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন "সে কি! আপনাদের মধ্যে কি অনেকে জীবন্ত অক্ষত অবস্থায় ম্যমি হয়ে যান?"

কাউণ্ট বললেন, "হ্যাঁ আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে যখন আমি ম্যমি হই তখন এটার খুবই চল ছিল। এই দেখুন না আমার বাবা। এক হাজার বছর বেঁচেছিলেন তারপর যখন ওঁকে ম্যমি করে দেওয়া হয় তখনও এমন কিছু বুড়ো হন নি। আমাদের পরিবারে প্রায় সবাই, সেই ভাবে মানে বেঁচে থাকতেই ম্যমি হয়েছেন। কেউ কেউ আবার ইচ্ছে করে ম্যমি হয়ে যান।"

"ইচ্ছে করে ম্যমি হয়, সে আবার কি?" বলুন না একটু," আমি জিগ্যেস করলাম। চশমার ভেতর দিয়ে আমাকে একনজর দেখে কাউণ্ট বললেন, "বলি তবে। আমাদের সময়ে লোকের সাধারণতঃ পরমায়ু ছিল আটশ, হাজার বছর মতো। আপনারা জানেন তো আমাদের সমাজে মানুষের দেহকে নানারকম ওষুধের প্রলেপ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। এই সব ওষুধের গুণ এমন ছিল যে মানুষের যে অবস্থায় ঘুম পাড়ানো হতো তার দেহ মন বুদ্ধি সব সেই অবস্থায় থাকতো। তাকে যদি পরে জাগানো হতো তা'হলে সে যে সময়ে ঘুমিয়েছে সেইভাবে জেগে উঠতো। এই দেখুন যেমন আমি সাড়ে সাতশ বছর বয়সে যেমনটি ছিলাম, এখন আপনারা আমায় সেইরকমই দেখছেন। ধরুন কারো ইচ্ছে হলো বুড়ো হওয়ার আগেই সে একটা ভালো বই লিখে মমি হবে তারপর আবার পাঁচশ বছর পরে উঠে দেখবে তার বইএর কি হাল হলো। হয়-তো জেগে উঠে সে নিজের বই আর নিজেই চিনতে পারলো না। এতরকম টীকা-টিপ্পনী পরিবর্তন হয়েছে বইএর। সে ইচ্ছে করলে আবার নিজের বইটা ঠিকঠাক করতে পারে এই আর কি? আমরা শুনে সব থ।

কাউণ্ট বললেন, "ম্যমি করাই বলুন, আর বেঁচে থাকাই বলুন সব বিষয়েই আমাদের কাছে আপনাদের শিখতে হবে।"

কাউণ্টের বড়াই করা দেখে ডাক্তারের হলো রাগ। বললে,

"আপনাদের সময়ে এই রকম বেশভূষা ছিল?"

আমরা কাউণ্টের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক। লজ্জা পেয়েছেন। বললেন,

"না, এই একটা ব্যাপারে আপনারা আমাদের হারিয়েছেন।"

ডাক্তার আবার বললেন, "আর কাশির লজেন্স?"

কাউণ্ট আবার বললেন, "না, তাও না।"

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখ)

নব্বই ফ্যাদম জলের তলায়

শ্রীধর সেনাপতি



ভূমধ্যসাগরের বুকে এল্‌বাদ্বীপের কাছে একটা ঝটিকা-ঝঞ্ঝাময় অঞ্চলে একটি প্যাসেঞ্জার জেট্‌ বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। সালটা ছিল ১৯৫৪। ইংরেজদের তৈরি মেশিনটি, এই সর্বপ্রথম শূন্যপথ পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর যে-কোন স্থানে পৌঁছতে পারবেঃ জগতের মানুষকে চমকে দেবার মতো নতুন খবর ছিল এটা। কিন্তু প্রথম বিমানখানারই অমন শোচনীয় পরিণতি দেখে দেশ বিদেশের বিমান বিশেষজ্ঞরা খুবই হতাশ হয়ে পড়লো। নতুন আবিষ্কৃত ওই জেট্‌ বিমান যাত্রীবহনের কাজে আদৌ নিরাপদ হবে কিনা, সন্দেহ দেখা দিল তাদের মনে।

কাজেই, সকলের মনে আস্থা এবং বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথম জেট্‌ বিমানটির ধ্বংসের মূলে কী ছিল, সেটা খুঁজে বের করা দরকার। ভবিষ্যৎ ডিজাইন-গুলো নিখুঁত করার জন্যেও ওই গলদটিকে চিনে রাখতে হবেই।

সুতরাং উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে গেল। চললো কারিগর বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানান্‌ আলাপ-আলোচনা। শেষে এক সময়ে ওই জেট্‌ বিমানের কর্মকর্তাদের দৃঢ়

ধারণা জন্মালো যে বিমানখানির ধ্বংসের মূল সূত্র গড়াগড়ি দিচ্ছে ভূমধ্যসাগরের গভীর জলের নীচে কাদাবালির মধ্যে। তাই ব্রিটিশ প্রধান নৌ-সেনাপতির দপ্তরকে জানানো হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রথম জেট্ বিমানটিকে সমুদ্রগর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। জানানোর তারিখ ছিল ১৬ই জানুয়ারি।

এ কাজের মধ্যে, বলা বাহুল্য, নানান্ জটিলতা রয়েছে। প্রথমতঃ জেট্ বিমানটির ধ্বংসের আসল চেহারাটি জানা নেই। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী মানুষকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তাদের একজন ভাস্কো নোমেলিনি দ্বীপের কৃষক। বিমানটিকে শূন্যে টুকরো টুকরো হয়ে সমুদ্রের বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়তে দেখেছে সে। অপর ব্যক্তির নাম লিওপোল্ডো লোরেঞ্জি, ড্রাইভার। বজ্রের মতো একটা আওয়াজ কানে এসেছিল তার। সেও দেখেছে ছোটবড় অনেক আগুনের গোলা সমুদ্রের বুকে ছিটকে পড়তে।

বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আরও খোঁজখবর নেওয়া হতে লাগলো। কম্যাণ্ডিং অফিসারের কাছে এক সময়ে এলো বেশ কিছু মূল্যবান খবর। ইতালীর সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে একদল মানুষ মাছ ধরছিল। জেট্ বিমানখানি ভেঙে পড়েছিল প্রায় তাদের কাছাকাছি জায়গায়। এবং ওই বিমানযাত্রী কোন মানুষকে যদি উদ্ধার করতে পারা যায়, এই সদিচ্ছায় তারা এগিয়েও গিয়েছিল কিছুদূর পর্যন্ত!

কাগজের ওপরে একটা চার্ট আঁকা হলো। মাছধরা মানুষগুলো সমুদ্রের যে যে অংশে ছিল সেই অংশগুলো থেকে সমুদ্রে যেখানে জেট্ বিমানখানি ভেঙে পড়েছিল সেই পর্যন্ত লাইন টানা হলো চার্টের ওপর। অতঃপর শুরু হলো আসল কাজ।

ভেঙেপড়া বিমানটির উদ্ধারকাজে অংশ নিল দুটো জাহাজ। একটির নাম এইচ.এম.এস র‍্যাঙ্লার—অতি দ্রুতগামী এ্যাণ্টিসাবমেরিন্ ফ্রিগেট্। অপরটির নাম এইচ. এম. এস সুরসে। জাহাজ দুটো গেল মাল্টা থেকে। স্থানীয় কয়েকটি মাছধরা নৌকোও ভাড়া নেওয়া হলো।

র‍্যাঙ্লারের মধ্যে রয়েছে ডুবোজাহাজ ধরার বিশেষ যন্ত্রপাতি, কয়েকটা ইস্পাতে তৈরী নৌকো—এক একটি নৌকো দু'শ ফিট্ করে লম্বা এবং বেশ গভীরও। চার্টের দাগ অনুযায়ী র‍্যাঙ্লার ভূমধ্যসাগরের এত গভীর প্রদেশ পর্যন্ত নেমে গেল যে ইতিপূর্বে আর কোন ডুবোজাহাজ তেমন কাজ করে নি। জেট্ বিমানটির যে-কোন আকারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করতে হবে র‍্যাঙ্লারকে। তাই ভূমধ্যসাগরের চিহ্নিত জায়গায় গভীর তলদেশে ডুবে দ্রুতগামী ওই ডুবোজাহাজ জল তোলপাড় করতে লাগলো। কিন্তু কোথায় কী? জলের মধ্যে সমুদ্রগর্ভে এমন কোন বিশেষ বস্তু দেখা যায় না, যা ওই প্রথম জেট্ বিমানটির একটা অংশ বলে চিহ্নিত হতে পারে।—

তবে অবস্থার মোড় ঘুরে গেল, যখন স্কাইওয়েজ ইয়র্ক এয়ারক্র্যাফ্টের পাইলট ক্যাপটেন ক্রসটনের কানে গেল খবরটা। প্রথম প্যাসেঞ্জার জেট বিমানখানি ধ্বংস হয়ে সমুদ্রবুকে পড়ে যাওয়ার ঠিক পরেই তিনি বিমান নিয়ে ওই অঞ্চল অতিক্রম করছিলেন। আর ঠিক ওই সময়ে কয়েকটি ইতালীর মাছধরা বোটকে ওই অঞ্চলের সমুদ্রে ভাসতে দেখে একজন ক্রু দৃশ্যটার ছবি তুলে নেয় তার ক্যামেরায়। ব্যাক্-গ্রাউণ্ডে এল্বাদ্বীপের পাহাড়ের ছবিও উঠেছে।

দুর্ঘটনার জায়গাটা প্রায় সঠিকভাবে চিহ্নিত হয়ে গেল এরপর। এ্যাণ্টি-সাবমেরিন ফ্রিগেট র‍্যাঙলারকে ছুটি দেওয়া হলো। সেটার জায়গায় এলো এইচ. এম. এস ওয়েকফুল। এতে রয়েছে জলের ভেতরের টেলিভিশন সরঞ্জাম। ওয়েকফুলের প্রথম কাজ হবে র‍্যাঙলার সমুদ্রের তলায় যে সব জায়গা জুড়ে শুধু অন্ধের মতো হাত্ড়িয়ে বেড়িয়েছিল, সেই জায়গাগুলোর ছবি তুলে ধরা। একটি ক্ষেত্রে নেভীর কৌতূহলী মানুষরা জেট্ বিমানখানির ধ্বংসাবশেষের ছবি দেখবার আশায় টেলিভিশন স্ক্রীনের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। টেলিভিশনের পর্দায় তাদের বিস্ময়ভরা চোখের সামনে ভেসে উঠলো ডজন ডজন রোমান্ জার, যেখানে বহু যুগ আগে ডুবে গিয়েছিল একটা মদ্যবাহী জাহাজ। ওই রকম একটা জার-এর ভেতর থেকে একটা কুৎসিতদর্শন দানবাকার ঈল্ (বানমাছ জাতীয়) বেরিয়ে এলো ধীরে ধীরে।

* * *

এক সময়ে কেপ্ ক্যালামিটা'র দক্ষিণে ভাড়া করা দুটো মাছধরা বোটের টানা-জালের তার জলের ভেতরে কিসে যেন আটকে গেল হঠাৎ। সেখান থেকে ডাক এলো ওয়েকফুলের কাছে। কিন্তু এমনই কপাল, ওখানকার প্রবল বাতাস আর সমুদ্রের সুবিশাল গভীরতায় টেলিভিশন সরঞ্জাম ব্যবহার করা তখন অসম্ভব হয়ে পড়লো। ওই আবহাওয়া শান্ত হলো ১২ই ফেব্রুয়ারি।

অতঃপর আর একখানা জাহাজ সী স্যাল্ভর গভীর সমুদ্রের তলায় ডুবে কাজের উপযোগী সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ওখানে এসে হাজির হলো। তা থেকে ভূমধ্যসাগরের গভীর জলে ধীরে ধীরে নামিয়ে দেওয়া হলো অত্যাধুনিক শক্তিশালী ক্যামেরা। হ্যাঁ, এবার ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটির কয়েকটি ভাঙা অংশ টেলিভিশনের ছোট পর্দায় ছবি হয়ে ভেসে উঠলো। ছবি দেখামাত্র দারুণ উত্তেজনা আর উৎসাহ ছড়িয়ে পড়লো কর্মীদের ভেতরে।

বিমানের ভাঙা অংশগুলোকে সুগভীর সমুদ্রতল থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে। তাই সেখানে আনা হলো আর একটি জাহাজ। নাম, বারহিল্। সমুদ্রবুকে বিপদে পড়া বা ধ্বংস হওয়া জাহাজকে উদ্ধার করা বারহিল্-এর প্রধান কাজ। এই জাহাজের মধ্যে রয়েছে মাইলের পর মাইল দীর্ঘ ভারী মজবুত তার এবং ছ'টি বিশাল আকারের নঙ্গর। নঙ্গরগুলোর এক একটির ওজন হবে পাঁচ টন।

বারহিল্কে শক্ত করে নঙ্গর করার পরেই কিন্তু আসল উদ্ধার কাজ আরম্ভ করা গেল না। সেই খারাপ আবহাওয়া আবার গোল বাঁধালো। তাই অপেক্ষা করতে হলো ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত।

ওখানে জলের গভীরতা অত্যন্ত বেশি। ভেবেচিন্তে তাই স্থির করা হলো, শুধু ডুবুরীর পোশাক ওখানে নিরাপদ হবে না। একটা 'পর্যবেক্ষণ-কক্ষ' দরকার। সমুদ্রের গভীর জলের মধ্যে সেটা থাকবে। কক্ষটির আকার এমন হবে, যার ভেতরে অন্তত একজন মানুষের থাকবার জায়গা হয়। সেটার চারপাশের দেওয়ালে থাকবে কয়েকটা মোটা মজবুত কাঁচ, যার ভেতর দিয়ে কক্ষের মানুষটি বাইরের সব কিছু দৃশ্য দেখতে পাবে। পর্যবেক্ষণ-কক্ষের মাথার কাছে ভেতর দিকে থাকবে ব্যাটারী-চালিত এক উজ্জ্বল আলো।

পরিকল্পনামতো একটা 'পর্যবেক্ষণ-কক্ষ' শক্ত মজবুত তারে বেঁধে জলের

ভেতরে নামিয়ে দেওয়া হলো এক সময়ে। কিন্তু প্রথমে ডুবুরী সমুদ্রতলে পর্যবেক্ষণ-কক্ষ থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে পর্যন্ত চোখে দেখতে সক্ষম হলো। তারপর অবশ্য অন্ধকারে তার চোখের দৃষ্টি আরও কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে ওঠার ফলে কিছুটা দূরে পর্যন্ত আরও দেখতে সক্ষম হলো সে। মাছধরা বোটের তারের সরু লাইন নজরে এলো। তখন জলের ওপরের জাহাজকে সজাগ করে দিয়ে ডুবুরী ওই লাইন ধরে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগলো বোটের তার ঠিক কোন্ জায়গায় কিসে জড়িয়ে গেছে খুঁজে দেখার জন্যে।

দেখা গেল, ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যাসেঞ্জার জেট্ বিমানখানির কিছু ভাঙাচোরা অংশের সঙ্গেই জড়িয়ে গিয়েছিল মাছধরা বোটের টানা জালের তার। এবার জাহাজ থেকে একটা প্রকাণ্ড যন্ত্র নামিয়ে দেওয়া হলো সেখানে। যন্ত্রটা রাক্ষসের মতো বিরাট হাঁ করে রইলো। সেটাকে জলের মধ্যে পরিচালনা করতে থাকলো ডুবুরী। বিধ্বস্ত বিমানের অংশকে শিকার ধরার মতো ওই হাঁ দিয়ে চেপে ধরলো যন্ত্রটি। তারপর ওপর দিকে উঠে গেল। যন্ত্রটাকে টেনে তুললো সী স্যালভর জাহাজ।

এটা একটা বিরাট জয়। সাফল্যের আশা গেল বেড়ে। আরও কয়েকদিন ধরে নিষ্ফল অনুসন্ধান চললো। যখন সন্দেহ দেখা দিচ্ছে এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন ওই জায়গার কাছাকাছি আবার একটা সন্ধান মিললো। জায়গাটা আগের মতো অত গভীরও নয়। তাই ডুবুরী নামানো হলো জলে। ডুবুরী সমুদ্রতলায় নেমে বস্তুটার সঙ্গে শক্ত তারের একটা দিক জড়িয়ে বেঁধে দিয়ে এলো। সেটাকে টেনে জাহাজের ওপরে তুলে এনে পরীক্ষা করে বোঝা গেল : বস্তুটা বিমানের পেছনদিকের কাঠামো। ঠিক ওই জায়গারই আশপাশ থেকে উদ্ধার করা গেল বিমানের আরও কিছু অংশ।

উদ্ধার করা বস্তুগুলোকে অবিলম্বে ফার্নবরোতে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে বিমানপোতের আচ্ছাদনের তলায় তৈরী করে রাখা হয়েছে কাঠের একটা ফ্রেম। উদ্ধার করা বস্তুগুলো ওই ফ্রেমওয়ার্কে যেখানে যেভাবে খাপ খায় ঠিক সেইভাবে পর পর সাজিয়ে রাখা হতে লাগলো। কলের করাত দিয়ে টুকরো টুকরো করা ছবি যেমন একসঙ্গে জোড়া লাগানো হয়, যাকে ইংরেজীতে 'জিগ্ স পাজ্ল' বলে, কাজটা প্রায় ওইরকমই।

বিমানখানির আরও আরও ভাঙা টুকরো আসছে, সেগুলো সাজাতে সাজাতে ক্রমশ আবার সেই অভিশপ্ত মেশিনের চেহারা ফিরে আসতে লাগলো একটু একটু করে। বিমানের ডানা আর পশ্চাদ্ভাগের জন্য একটা বিশেষ ইউনিট্ কাজ করতে লাগলো। তারা বিমানটির শূন্যে ওড়ার শক্তি পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো অন্য একটি মেশিনের সাহায্যে যে মেশিনসব সময়ে ক্যান্বেরা অরজারভেশন এয়ারক্র্যাফ্টের সঙ্গে থাকে। জরুরী সার্ভিসগুলো—যেমন, তেল ফুয়েল হাইড্রলিক্ সিস্টেম ইত্যাদির মধ্যে কোন রকম গলদ ছিল কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা হলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তৈরী করা হলো অনেকগুলো মডেল। যে ভাবে প্রথম জেট্ প্যাসেঞ্জার বিমানখানা ভূমধ্যসাগরের বুকে ভেঙে পড়েছিল, ঠিক সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি করা হতে লাগলো ওই সব মডেলগুলোকে নিয়ে।

ভূমধ্যসাগরের আবহাওয়া খুবই প্রতিকূল। তা সত্ত্বেও বিমান উদ্ধারের

কাজ একদিন চরম পর্যায়ে পেঁাছে গেল। ১৫ই মার্চের মধ্যে সমুদ্রতল থেকে পর পর উদ্ধার করা হলো বিমানের মধ্যাংশের পেছন দিকের ৫৫ ফিট্ দীর্ঘ একটা অংশ যেটাকে বলা হয় স্পার। ওই একই জিনিস ছিল সামনের দিকেও। সেটা মাপে আরও বড়। ডুবুরী জলের তলায় বিমানের দুটো ইঞ্জিনও দেখতে পেল।

৩০শে মার্চ। ডুবুরী ডোচার্টি ভূমধ্য-সাগরের ৭০ ফ্যাদম জলের নীচে থেকে জানালো, ও একটা বিশাল আকারের জিনিস খুঁজে পেয়েছে। জিনিসটাকে যখন সমুদ্রতল থেকে উদ্ধার করে জাহাজের ডেকে তুলে আনা হয়, দেখা যায় সেটা বিধ্বস্ত বিমানের সামনে থেকে ডানা পর্যন্ত প্রধান অঙ্গ, যার মধ্যে রয়েছে বিমানের শূন্যে ওড়া নিয়ন্ত্রণ করার সম্পূর্ণ যন্ত্র-পাতি, কক্‌পিট, অর্থাৎ বিমান চালকের বসবার জায়গা এবং অন্যান্য আরও কিছু সরঞ্জাম।

প্রধান উদ্ধার কাজটিতো এখন তাহলে শেষ হলো। কিন্তু এমন দুরূহ কাজ কি এর আগে হয়েছিল কখনও? এই বিশেষ কাজটির জন্য কখনও কখনও ভূমধ্য-সাগরের নব্বই ফ্যাদম জলের নীচে পর্যন্ত হাতড়ে বেড়াতে হয়েছে ডুবুরীকে।

যাই হোক, মানুষের ধৈর্য অধ্যবসায় আর সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতির কল্যাণে ইংরাজদের তৈরী প্রথম জেট প্যাসেঞ্জার বিমানখানার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মূল কারণটাও খুঁজে পাওয়া গেল একসময়ে। জনৈক যন্ত্রবিদ্ বিজ্ঞানী বিমানের একটি জানলার কাছে মোড়া ধাতুর পাতের মধ্যে একটা ফাটল দেখিয়ে বললেনঃ 'বল্টুর সারির মধ্যে, যেখানে ধাতুর পাতে ফাটল ধরেছিল, বিমানখানির ধ্বংসের মূল কারণ লুকিয়ে রয়েছে ওই জায়গায়।'

(৯ পৃষ্ঠার পর)

কাউণ্টকে দুটো ব্যাপারে হারিয়ে আমরা খুশী হয়ে উঠলাম। দেখি ভোর চারটে।

পরের দিন আবার বসা হবে ঠিক করে যে যার বাড়ি ফিরলাম।

---

* বিখ্যাত আমেরিকান লেখক এডগার এলেন পোর ছোট গল্প "Some words with Mummy"র ছায়ানুবাদ।

লেখক পরিচিতি ঃ--এডগার এলেন পো ১৮০৯ সালে আমেরিকার Boston শহরে জন্মান। ছোটবেলা মা মারা যান। অন্য এক পরিবারে মানুষ হয়েছিলেন। ইউনিভারসিটির পড়া শেষ করে পড়ানো শুরু করেন। ছাত্র অবস্থাতেই গল্প কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। আমেরিকান সাহিত্যে ছোট গল্প লেখক ও কবি হিসাবে বিখ্যাত। ১৮৪৯ সালে মারা যান।

ম্যামিঃ—প্রাচীন মিশরীরা মানুষ মারা গেলে তার শরীরে নানারকম সুগন্ধি ওষুধ মাখিয়ে বাক্স করে রেখে দিত। তারা মৃতদেহ দাহ বা কবরস্থ করতো না।

বাঁশ গাছের কি ফুল হয়ঃ

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে বাঁশ যেহেতু সপুস্পক উদ্ভিদ দলের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু বাস গাছেরও ফুল হয়। বিভিন্ন প্রজাতির ফুল আসার সময় বিভিন্ন। বৈজ্ঞানিক গণ মনে করেন বাঁশের বীজ থেকে চারা এবং চারা থেকে বাঁশ গাছে ফুল ফুটতে এক থেকে ১০০ বছর সময় লাগে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সে সব আমার হয়েছে। বললেন উত্তর-কাশীর লামা, আপনাদের ক্যাম্প বয় মুলো সেরিং থাকতে কারও দেরী হবার উপায় আছে? এই সবাই মাল তোলো; চল এগোনো যাক।

ওঁর নির্দেশ পেয়ে ভীষণ জোরে শিস্ দিয়ে পোর্টাররা পিঠে মালের বোঝা তুলল। সার বেঁধে একের পিছনে অন্য—ওরা এগিয়ে গেল এক দিকে।

নিজের রুকস্যাকটা হিদায়েতের হাত থেকে নিয়ে পিঠে তুললেন উত্তর-কাশীর লামা। আর কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলেই হাতের লাঠি ঠুকে গট গট করে সবার সামনে এগিয়ে গেলেন। সামনে থেকে পিছন ফিরে বললেন, আসুন আপনারা সবাই আমার পিছন পিছন। এ অঞ্চল আমার নখদর্পণে। আমরা সোজা তুষার দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানেই উপর থেকে একটা হিমবাহ নেমে এসেছে নিচে। সেটাই হবে আমাদের উপরে চড়ার পথ। আমরা বেলা শেষে পৌঁছবো সেখানে।

ঢাল বেয়ে দালখেন গুম্ফার সামনে পৌঁছলো সকলে। সেখানে গুম্ফার বিশাল ফটকে দাঁড়িয়ে জপমন্ত্র ঘোরাচ্ছিলেন বড় লামা। অন্য আরও অনেক লামা তাঁর আশপাশে দাঁড়িয়ে ছিল শান্ত ভাবে। হাত তুলে বড় লামা দলের সবাইকে তাঁর আশীর্বাদ জানালেন।

গুম্ফা ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়েই ঢালু পথটা ভীষণ সরু হয়ে গেছে। দুজন পাশাপাশি চলা যায় না। এক

পাশে তার উঠে যাওয়া ঢালু জমির বুকে ঘন জঙ্গল। আকাশ ছোঁওয়া বিশাল বিশাল গাছে ভরা। অন্য দিকে খাড়া অতল খাদ। কাঁচা পায়ে চলা পথটা বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে। একটা ঘন জঙ্গল ভেদ করে নিচের দিকে নেমে গিয়েছে। অন্যটা গেছে পাহাড়ের কিনারা ঘেঁষে সোজা। সেখানে পেঁছে উত্তর-কাশীর লামা বললেন, এই নিচের পথই গেছে গোনাং বস্তিতে। আপনাদের সব পোর্টারই ওখানকার লোক। তবে সামনের পথটা ধরেই আমরা এগোবো। নিচের পথে বস্তি হয়ে গেলে সোজা পথ পেতে পারি, তবে তাতে দু'দিনে পেঁছব বরকাম মুল্লুকে। আর সামনের পথটা ধরে একটা বড় টিলা পার হয়ে গেলে সন্ধ্যার আগেই পেঁছতে পারব। ওই পথেই চলেছি আমরা।

হারজিন্দার বলল, এই প্রথম কারও কাছে শুনলাম যে সময়ের দাম আছে। ধন্যবাদ—

হিদায়েৎ বলল, সামনের চড়াইয়ে আপনার রুকস্যাকটা কিছুক্ষণের জন্য আমাকে দিতে পারেন আপনি। আপনি ক্লান্ত।

উত্তরে উত্তর-কাশীর লামা কটমট করে তাকালেন ওর দিকে। ও তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল দৃষ্টির সামনে থেকে।

গোম্বু বলল, রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তুষারপাত হয়েছে। সামনের চড়াতে নতুন আলগা বরফ পাওয়া যাবে। সবাই সাবধান।

উত্তর-কাশীর লামাও বললেন, হ্যাঁ, বরফ পিছনে পড়ার ভয় আছে। আর লোকে বলে গোলাং-এর চড়াই প্রাণঘাতী চড়াই। সবাই সাবধান। সামনের বনটা পার হলেই চড়াই আরম্ভ।

ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ওরা ভিজে স্যাঁতসেঁতে জঙ্গলটা পার হয়ে গেল। জঙ্গলে প্রচুর জোঁক। জঙ্গল যেখানে শেষ তার কিনারা থেকেই দিগন্ত জোড়া খাড়া ন্যাড়া একটা মাটি আর পাথুরে ঢাল প্রায় দেওয়ালের মতই আকাশ আটকে দাঁড়িয়ে। তার সারা গায়ে এখানে ওখানে নতুন পড়া বরফ ভোরের আলোয় লালচে হয়ে উঠেছে। পায়ে চলা পথটা জঙ্গল থেকে বার হয়েই এঁকে-বেঁকে সামনের এক পাথুরে চাটানের উপর দিয়ে বড় বড় কতকগুলো ছড়ানো চাঁই পাথরের আড়ালে চলে গেছে।

পোর্টাররা ঢালের মুখে পড়েই জোরে জোরে শিস্ দিতে লাগল। এমনি করেই চড়াইয়ের মুখে ওরা দম ঠিক রাখে।

পাথুরে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে অলোক জিজ্ঞাসা করল, এই পাহাড়ের ওপারেই কি বরকাম মুল্লুক, উত্তর-কাশীর লামা ?

উনি বললেন, না না, এ পাহাড়ের ওপারেও দুটো গ্রাম আছে। সেখানে যাবারও দুটো পথ। একটা পাহাড়ের নিচে নিচে, ঘুর পথ। অন্যটা সামনের চড়াই ভেঙে। আমরা সামনের পাকদণ্ডি ধরে এগোবো। সবাই সাবধানে আসুন পিছন পিছন।

অলোক পিছিয়ে গেল, পাহাড়ের বুকে কেমন করে পথের নিশানা রাখতে হবে তা বুঝিয়ে দিল, যারা নিশানা রেখে আসছে তাদের। ছোট কাঠের ডাণ্ডায় রঙিন নিশানা লাগিয়ে কিছু দূরে দূরে পুঁতে এতক্ষণ এগোচ্ছিল ওরা। পাহাড়ের চড়াইতে তার সঙ্গে পাথুরে দেওয়ালে শক্ত করে পোতা লোহার গেঁজের সঙ্গে

আটকানো দড়ির নিশানাও রাখতে হবে। যা ধরে ভারী মাল নিয়ে উঠে আসতে পারবে পিছনের সকলে।

পাথুরে চাটান পার হয়ে বিশাল চাঁইগুলো বেড় দিয়ে পাকদণ্ডির সামনে পৌঁছলো ওরা। পায়ে চলা পথটা ওখান থেকেই রুক্ষ পাথুরে ঢাল বেয়ে উপরে উঠে গেছে। সে পর্যন্ত পৌঁছে একটু থামল পোর্টাররা। কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার ঘন ঘন শিস দিতে দিতে চড়াই ভাঙতে আরম্ভ করল। সবার সামনে উত্তর-কাশীর লামা দিক ঠিক করছেন। মাঝে গোম্বু আর হিদায়েৎ। তারপর অলোক। আর সবার শেষে হারজিন্দার। অলোক তাকেই ভার দিয়েছে গোটা দলটার উপর নজর রেখে এগোবার।

কাশীর লামা আর হারজিন্দার ছাড়া অন্য সবাই মাঝে মাঝে তাদের জায়গা বদল করে নিচ্ছিল।

এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে পাকদণ্ডি পথটা ক্রমে উপরের ছোট্ট সমতলে পৌঁছাল। দম হারিয়ে সকলেই ওখানে একটু থামল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কনকনে বাতাস বইছিল উত্তর দিক থেকে। সে বাতাস কেমন যেন শুকনো।

অধিত্যকার সমতলের শেষ থেকে অন্য দিকেও ঢাল নেমে গেছে নিচের দিকে। পায়ে চলা পথটা সেই ঢালের বুক চিরে এঁকে বেঁকে নেমে গেছে নিচের দিকে। অনেক নিচে একটু সমতলের বুকে পাশা-পাশি দুটো ছোট্ট বস্তি। খেলনার মতো ছোট ছোট ঘরগুলো দেখা যাচ্ছিল। চার পাশে তার ধাপে ধাপে কাটা ছোট্ট ছোট্ট সবুজ খেত। খেতজমির শেষ থেকেই শুরু গভীর জঙ্গলের। বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো সেই জঙ্গল। অসমতল জমির বুকে ধাপে ধাপে উঠে গেছে সেই জঙ্গল ক্রমে বরফ সীমানার দিকে। হঠাৎ জঙ্গলের শেষ থেকেই শুরু হয়েছে দিগন্ত জোড়া একটা বরফের চাটান। তার পরেই দূরে সারা গায়ে বরফের সাজ পরে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে দালখেন পর্বতমালা। এপাশে ওপাশে যতদূর দেখা যায় জমাট বাঁধা বরফ আর বরফ। চূড়ার কাছটা ঘন কালো কুয়াশায় ঢাকা। যেন বরফের তৈরি এক ভয়ংকর দৈত্য আকাশের কোন অজানায় তার মাথা লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ বীভৎসভাবে আত্মপ্রকাশ করে সকলকে ভয় দেখাবে বলে।

হারজিন্দার বলল, কি সর্বনাশ, ওখানে এখনও তুষারপাত হচ্ছে বলেই তো মনে হয়। আমাদের এ পরিশ্রম কি তবে বৃথা যাবে!

ঘন কুয়াশায় ঢাকা দালখেন পর্বত-মালার দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উত্তর-কাশীর লামা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, কুয়াশা আর অন্ধকার দেখে ভয় পেলেন নাকি আপনি?

চমকে গেল হারজিন্দার। ও কখনও ভাবতে পারেনি ওকে কেউ এমন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে। কিছুক্ষণ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, পাহাড়ের বুকে তুষারপাতকে যে ভয় করে না, তার মাথায় গোলমাল আছে উত্তর-কাশীর লামাজী, আমিও ভয় পাই।

—তবে এলেন কেন এ পথে?

কেমন করে যেন হাসল হারজিন্দার। বলল, এর উত্তর তো সোজা লামাজী, এমন ভয় পেতে ভাল লাগে আমার। তাই এসেছি। তা ছাড়াও কথা আছে। সব কথা তো আর সবাইকে বলা যায় না।

এই উত্তর শুনে থমকে গেলেন উত্তর-কাশীর লামা। একটু ভেবে বললেন, কারও গোপন কথা জানার আগ্রহ আমার নেই। তবে বন্ধু, পিঠে তো অনেক বোঝাই বইছেন। এ পথে তার সঙ্গে আর মনের বোঝার ভারটা যোগ করবেন না। সে বোঝা হবে বড় বেশি ভারী। হাঁপিয়ে পড়বেন।

উত্তর শুনে কেন যেন মাথা নিচু করল হারজিন্দার। হিদায়েৎ তাড়াতাড়ি বলল, কিন্তু আমাদের এদিক তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আমার মনে হয়, আস্তে আস্তে ওদিকও পরিষ্কার হয়ে যাবে। তা ছাড়া মেঘ বা কুয়াশা হলেই যে তুষার-পাত হবে এমন কথা নয়।

ফিরে দাঁড়িয়ে উত্তর-কাশীর লামা বললেন, ওখানে তুষারপাত হচ্ছে না বলেই আপনার ধারণা ?

চার দিক দেখে শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। তবে পাহাড় সম্বন্ধে আমার সঙ্গীরা আমার থেকে বেশি অভিজ্ঞ। সঠিক তাঁরাই বলতে পারেন। বিশেষ আবহাওয়া সম্বন্ধে।

একথা শুনে উত্তর-কাশীর লামা হঠাৎ অলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা এসেছেন সরকার পক্ষ থেকে। পথে আবহাওয়ার খবরাখবর জানার কোনো ব্যবস্থা করেছেন কি ? সামনে চির তুষারের রাজত্ব। ওখানে অন্তত পাঁচ সাত দিন কাটাতে হবে আমাদের। তখন তো প্রতি-পদে আবহাওয়ার খবর জানা প্রয়োজন হবে। তার কি কোনো ব্যবস্থা আছে আপনাদের ?

এ প্রশ্ন শুনে থমকে গেল অলোক। সত্যি তো তাড়াহুড়ো করে পথে বার হয়ে এসেছে ওরা সবাই। কারও মনে তখন তো এসব কথা জাগেনি ! আবহাওয়া সম্বন্ধে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। বিশেষ যখন ওদের প্রায় ডেথ জোন পর্যন্ত চড়াই ভাঙতে হবে। ক্যাপ্টেন ধিলনের মনেও কি এসব কথা জাগেনি !—কি যে উত্তর দেবে অলোক ভেবেই পেল না।

হারজিন্দার বলল, ও বিষয়ে কোনো চিন্তা করবেন না আপনারা। আমি তাহলে এসেছি কি করতে ? আমাদের সঙ্গে আপাতত এ পথে কোনো যোগাযোগ যন্ত্র না থাকলেও, আমাদের অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে রেডিও কমিউনিকেশন যন্ত্র-পাতি পেঁাছে যাবে। পিছনে কেউ না কেউ সে যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে। সারা পথে সঙ্গে থাকবে ওয়াকিটকি। এই সব রেডিও যন্ত্র চালু রাখাই তো হবে আমার প্রধান কাজ।

উত্তর-কাশীর লামা বললেন, যাক তা হলে একটা চিন্তা গেল। আবহাওয়া সম্বন্ধে আমাদের আর ভাবতে হবে না। কিন্তু সামনের ঐ দেওয়াল বেয়ে উপরে ওঠা খুব সহজ কাজ হবে না। তবে একটা হিমবাহর তলায় পেঁাছব আমরা, তার ঢাল বেয়েই ওঠার কথা চিন্তা করতে হবে।

গোম্বু বলল, সেটাই সহজ হবে। দরকার পড়লে জমাট বরফে ধাপ কাটব আমরা। পাশে শক্ত লোহার গেঁজ পুতে তাতে দড়ি লাগাবো টানা। সেই ধাপ বেয়েই মাল নিয়ে উঠতে হবে সবাইকে।

উত্তর-কাশীর লামা বেশ চিন্তা নিয়ে বললেন, কিন্তু এদিকে যখন তখন বরফের ধ্বস নামে। বিরাট বিরাট ধ্বস। ধ্বসে পথ মুছে গেলে কাজ দ্বিগুণ বাড়বে।

হিদায়েৎ বলল, কাজটা দেখছি খুবই পরিশ্রমের আর বিপদজনকও। সারাক্ষণ প্রাণ হাতে করে বরফের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যতক্ষণ না শেষ বোঝাটা কনক-শম্ভুনাথজীতে নিরাপদে পেঁাছচ্ছে।

গোম্বু বলল, কিন্তু সেখানেই আমাদের কাজের শেষ নয় তো। বন্দী হতভাগ্য যাত্রীদের বয়ে নিয়ে আবার ও পথেই ফিরে আসতে হবে। সে অতি ভয়ংকর ব্যাপার।

হারজিন্দার একথা শুনে কটমট করে তাকালো ওর দিকে। কিন্তু কিছুই আর বলল না।

হিদায়েৎ হেসে বলল, পথ আমরা পাকাপাকি বানাব। দেখবেন কোনো কষ্টই হবে না। তা ছাড়া আমরা কজন সারাক্ষণ চলাচল করে ও পথ চালুও রাখব।

কথাটা ঠিক বলেছেন। বললেন উত্তর-কাশীর লামা, ভাল কথা, আমার সঙ্গে তো আপনাদের কারও এখনও আলাপ হয়নি। আপনার নাম ?

এই ভয়ই এতক্ষণ মনে মনে করছিল অলোক। কনকশম্ভুনাথজী হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র। অথচ হিদায়েৎ মুসলমান। সরকারের আর কি, সবাইকেই এক সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। এমন কি সঙ্গে একজন সিডিউল কাস্টও আছে ; হরকিষণ যাদব। হয়ত তার হাতে জল চলে না ! শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে একটা গোলমাল না বাঁধে !

নাম জিজ্ঞাসা করাতে হিদায়েৎও থমকে গিয়েছিল। একটু থেমে একটু ভেবে ও স্পষ্ট করেই বলল, আমার নাম হিদায়েতুল্লা। আমি মুসলমান।

—এ্যাঁঃ, আপনি মুসলমান ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন উত্তর-কাশীর লামা, আরে আপনি কি জানেন না কনকশম্ভুনাথজী হিন্দুদের তীর্থস্থান ?

—জানি, তা ভাল করেই জানি। বলল হিদায়েৎ, আমার ওখানে যাওয়াতে কোনো বাধা আছে নাকি।

—এখন একথা ভেবে আর লাভ কি ?

—আমি ভাবছি না। বলল হিদায়েৎ, আমার কাছে বিপদে পড়া মানুষগুলোর চিন্তাই বড় বলে মনে হয়েছে। তাই বিনা দ্বিধায় এগিয়ে এসেছি। এখন আপনি বললে আমি ফিরে যাব। ধর্মের নামে আমি কোনো গোলমাল চাই না।

—ফিরে যাবেন ? তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়িয়ে হিদায়েতের হাত ধরে ফেললেন উত্তর-কাশীর লামা, কি বলছেন আপনি ! ফিরে যাবেন কেন, বিধর্মী বলে ? আরে মশাই, অপরের বিপদের কথা শুনে যে মানুষটা তার নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ছুটে আসে, সে বিধর্মী ! এ হতেই পারে না। এ আমি বিশ্বাস করি না।

কনকশম্ভুনাথজীতে আপনারই সবার আগে যাবার অধিকার আছে।

হিদায়েৎ বলল, ধন্যবাদ উত্তর-কাশীর লামাজী। আমাদের বিশ্রাম নেওয়া বোধ হয় শেষ হয়েছে। এবারে নামতে হবে। আপনি এগিয়ে পথ দেখান।

দাঁড়ান, দাঁড়ান, বললেন উত্তর-কাশীর লামা, সবার সঙ্গে পরিচয় পর্বটা আগে শেষ করে ফেলি। এক সঙ্গে এতদূরে চলব, অথচ কেউ কাউকে চিনব না, তা তো হতে পারে না।

অলোক হাসিমুখে এগিয়ে এসে এক এক করে দলের সবার পরিচয় দিল। বলল, তোমরাও সবাই তো উত্তর-কাশীর লামাজীকে এতক্ষণে ভাল ভাবেই চিনেছ। উনিই আমাদের দালখেন হিমবাহর কাছে নিয়ে যাবেন। (চলবে)


এদিকে জোনাথন হার্কারের বাগদত্তা মীনার সাথে লুসির বন্ধুত্ব। লুসি আর্থার বলে আরেক ভদ্রলোকের বাগদত্তা!
মীনার চিঠি— এসেছে। ও আজকেই এখানে বেড়াতে আসছে!
যাক। কয়েকদিন আনন্দ করা যাবে!
আরে! এইতো : মীনা এসে গেছে!
পরে —
কেমন আছিস বল? জোনাথনের খবর কি!?
আরে সেই ব্যাপারেই তো চিন্তায় পড়েছি! ট্র্যানসিল--ভেনিয়া না কোথায়, এক হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে!
অবশ্য-শীগগীর-ই ফির-বে লিখেছে। তোর মা এখন কেমন আছেন?
মায়ের শরীর ভালোনা। এদিকে এক কান্ড হয়েছে জানিস!

ড্রাকুলা

চিত্র : ইন্দ্রনীল ঘোষ
নাট্য: সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়





ইলশেগুড়ি ও ছোট্ট বুড়ি

দীপক মজুমদার

ইলশেগুঁড়ি ইলশেগুঁড়ি,
চ'ল্লে কোথায় শিলিগুড়ি ?
মচ্‌কি হেসে ইলশেগুঁড়ি—
ব'ল্লে আমায় ছোট্ট বুড়ি
যাচ্ছি আমি ময়নাগুঁড়ি
গাড়িটির নাম হামাগুড়ি।
আদর পেলে থেকেই যাবো
নয়তো যাবো পাতালপুরী।

মুসকিল আসান

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

পটলার অসুখে
এলো এক ডাক্তার
সকলেই জানে তাঁকে
ভারি নাম ডাক তার
দেখলেন নাড়ী টিপে
বুক পেট দেখলেন
সবকিছু দেখেশুনে
যাহা তিনি বললেন
সে খবর ভালো নয়
ঔষধ পত্তর
চললো তা দিন রাত
সারে যাতে সত্বর
অথচ হল না কিছু
বোঝা গেল আশা নেই
সহসা সারিয়ে দিল
মুসকিল আসানেই।
তাজ্জব ভোজবাজী
নাকি ওরা দেবদূত
বলুক যা খুশি যার
ব্যাপারটা অদ্ভুত।

বর্ষায় কলকাতা

দেবকুমার ভট্টাচার্য

শ্যামবাজার আর কলেজ স্ট্রীটে
একটু জমে জল,
টানা রিক্সা ঘন্টি নেড়ে
ছুটছে ছলাৎ ছল।
সল্‌ট লেকেতে পাঁচটা ব্যাঙ
একটু জল ঘিরে,
গান ধরেছে প্রাণটা খুলে
লোকজনের ঐ ভিড়ে।
ধর্মতলায় ব্যাঙেরা সব
ভুগছে সর্দি-জ্বরে
কেউ জানেনা, কখন কোথায়
কে বাঁচে, কে মরে।



খান্না মশাই খান না কিছু



রমেন চৌধুরী

পান না ব'লে খান্না মশাই
মোটেই কিছু খান না,
কিন্তু তিনি বড্ড মানী
তাই মানতে চান না।
মুখে বলেন সয়না পেটে
আড়ালে নেন পাত্র চেটে
যেমন গুণী গবুচন্দ্র
নেই গলা তাই গান না,
লোকে জানে গুরুর নিষেধ....
ভাঙেন তো মচকান না॥

আজব জলসা

অসিত সাহা

গান গাইছে কান ফাটিয়ে
স্টেজে উঠে শেয়াল
খালি গলায় গাইছে গান
মিটিয়ে মনের খেয়াল!
তবলা বাজায় ভোঁদর ভায়া
পাগড়ি মাথায় পরে,
নেংটি ইঁদুর নৃত্য করে
আঁচলটি তার ধরে।
লোক এসেছে অনেক সেথায়
দেশ বিদেশ থেকে'
হাত তালি আর বাহবা দেয়
নেংটির নাচ দেখে।

ছড়া

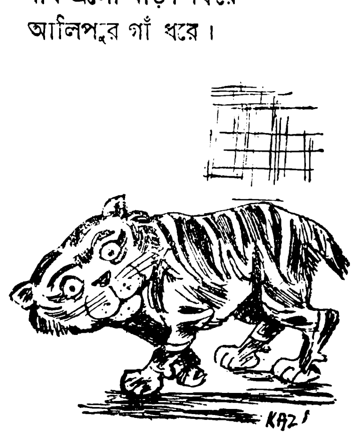
সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

জ্বর গায়ে ভোলারায় রবিবার দুপুরে,
দুধ আর সাবু খায় চুক চুক চুকুরে
তারপর টেবিলেতে কাপখানি রাখতে—
পিপীলিকা ছুটে আসে সারা দেহে মাখতে!
দুধসাবু উপকারী জানে বুঝি তাহারা
গায়ে মেখে পার হবে হিমালয়, সাহারা!

বাঘের রাগ

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

বাঘ গেল রাগ করে
সোজা বাগমারীতে।
বাঘাদার পিসতুতো
মাসীমার বাড়ীতে।
মাসীমারা খেতে দিল
চাকী মেরে তখুনি।
ছাঁকা তেলে ভেজে দিল
গোটা গোটা শকুনি।
রাগ গেল জল হয়ে
মাসীমার আদরে।
বাঘ এলো বাড়ী ফিরে
আলিপুর গাঁ ধরে।



স্রষ্টা বিজ্ঞানীর করুণ মৃত্যু



শ্রীসুব্রত দাস

সূর্যের সংসারে নয়টি গ্রহের মধ্যে পৃথিবী কত না বৈচিত্র্যে ভরা। বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে মানব সন্তানেরা কত অজানা রহস্যের সন্ধান সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরেন তাদের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। বস্তু জগতে আমরা তা কার্যে গ্রহণ করে হই ধন্য। তাঁদের নিষ্ঠা আর বিজ্ঞান বীক্ষণাগারে অজানাকে জানার কৃচ্ছ্র সাধনার অক্লান্ত পরিশ্রমের নতুন নতুন আবিষ্কারে জগতবাসী হন স্তম্ভিত।

আজ বলছি এমন একজনের কথা যাঁর আবিষ্কার আজও রয়েছে অমর। তিনি হলেন ফরাসী দেশের অভিজাত বংশের সন্তান ও আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা—অ্যাণ্টয়েন লরেণ্ট ল্যাভয়সিয়ার। তাঁর অভূতপূর্ব আবিষ্কারে রহস্যময় রসায়ন বিজ্ঞান কল্পনার জগত ছাড়িয়ে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তিতে হয় সমৃদ্ধতর।

এই অমিতধর পুরুষ ও রসায়নের স্রষ্টা অ্যাণ্টয়েন ল্যাভয়সিয়ারের জন্ম হয় ১৭৪৩ খৃীঃ প্যারিস শহরে। বয়সে ছিলেন সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী শীলির সমবয়সী। ম্যাজারিন কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করে গবেষণা কার্যে করেন মনোনিবেশ এবং মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি আকাদেমি অব সায়েন্সে লাভ করেন সদস্যপদ।

আজ রসায়নশাস্ত্র পড়লে আমরা কত মৌল, যৌগ, মিশ্র পদার্থের সন্ধান পাই। কিন্তু প্রাচীনকালে মাটি, জল, বায়ু ও আগুন এই চারটিই ছিল পণ্ডিতদের কাছে মূল পদার্থ। এই চারটি ছাড়া অন্য কোন পদার্থের কল্পনা তাঁরা সে সময়ে করতেও পারেন নি। আধুনিক রসায়ন অধ্যয়নে এই অমিতধর পুরুষ ল্যাভয়সিয়ারের প্রমাণে দেখা যায় মাটি, জল, বায়ু ও অগ্নি কোন মূল পদার্থ নয়। তিনি প্রমাণ করেন মাটি, তামা, লোহা, সিসা, ইত্যাদি বহুরকম পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। জল, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন নামক গ্যাসীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত। আর অক্সিজেনের সঙ্গে উত্তপ্ত অঙ্গারের মিলন প্রক্রিয়ায় প্রজ্বলিত হয় আগুন। কিন্তু এই রাসায়নিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সমকালীন রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছ হতে পেয়েছেন বিদ্রূপ ও লাঞ্ছনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সতের শতাব্দীতে যখন রসায়ন শাস্ত্র উন্নত ছিল না তখন জার্মানীর প্রুশিয়া দেশের রাজ চিকিৎসক ও রসায়ন বিজ্ঞানী স্ট্যাহল ফ্লোজিস্টন নামক এমন এক মূল পদার্থের আবিষ্কার করেন যা স্পর্শ করা বা চোখে দেখা যায় না। প্রায় দেড়শত কাল ধরে স্ট্যাহলের আবিষ্কৃত কাল্পনিক ফ্লোজিস্টন, রসায়ন বিজ্ঞানীদের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যা বাস্তবে পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তি ছাড়াই তাঁরা ফ্লোজিস্টন তত্ত্বদ্বারা সকল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতেন। এরপর ১৭৭০ থেকে ১৭৮৫ খৃীঃ এই

পনেরো বৎসরের মধ্যে রসায়ন বিজ্ঞানে ঘটে যায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন। স্বল্পভাষী সুইডিশ রসায়ন বিজ্ঞানী শীলি যখন অক্লান্ত গবেষণায় আবিষ্কার করেন অক্সিজেন তখন এই ক্লাপনিক ফ্লোজিস্টনের প্রভাব ছিল এতই প্রবল যে আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তিনি ফ্লোজিস্টন বিহীন বায়ু নামে করেন অভিহিত। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিসটলীও অক্সিজেন আবিষ্কার করে এই ক্লাপনিক ভাবনাকে পারেননি দূর করতে।

ফ্লোজিস্টনের অর্থ হলো—অগ্নি উৎপাদক। স্ট্যাহল বলতেন কয়লা, কাঠ বা তেলের মত দাহ্য পদার্থে থাকে প্রচুর পরিমাণে ফ্লোজিস্টন। এর দ্বারাই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। ফ্লোজিস্টন নির্গত হলে কয়লা ছাইতে পরিণত হয়। আবার কোন লোহাভস্ম যদি কয়লার সঙ্গে পোড়ানো হয় তবে উহা পুনরায় লোহাতে পরিণত হয়। এ সময়ে গবেষণা কার্যে তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। কিন্তু অমিতধর পুরুষ ও রসায়ন শাস্ত্রের স্রষ্টা অ্যান্টয়েন লরেন্ট ল্যাভয়সিয়ার প্রত্যক্ষভাবে স্ট্যাহলের এই তত্ত্বকে পারেন নি সমর্থন করতে। তিনি গবেষণা কার্যে ব্যাপকভাবে তুলাদণ্ডের ব্যবহার করেন এবং ফ্লোজিস্টন তত্ত্বের মধ্যে গরমিল প্রত্যক্ষ করেন। বিজ্ঞানী শীলির মতন বোতলভরা বায়ুর মধ্যে লোহা উত্তাপে ভস্ম করে দেখতে পান লোহা বোতলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়ু গ্রাস করে ভস্মে পরিণত হয় এবং বোতলে যে বায়ু থাকে তার মধ্যে আগুন জ্বালানো যায় না। এরপর তিনি বৃটিশ বিজ্ঞানী প্রিসটলীর পারদভস্ম হতে অক্সিজেন আবিষ্কারের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করেন এবং অলীক চিন্তাপ্রসূত ক্লাপনিক ফ্লোজিস্টনের প্রভাব হতে সকল রাসায়নিক বিজ্ঞানীদের করেন মুক্ত।

প্রায় দেড়শত কালের ফ্লোজিস্টনের ভূত পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে হয় পরাভূত। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রমাণিত করেন যে—

(ক) বায়ু দু'রকম গ্যাসে তৈরী। একটি গ্যাসের নাম দেন অক্সিজেন ও অপর গ্যাসটির নাম দেন অ্যাজোট, পরে এই অ্যাজোটের নাম হয় নাইট্রোজেন।

(খ) বায়ুর অক্সিজেনের জন্য বায়ুতে আগুন জ্বলে আর বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে উত্তপ্ত ধাতু মেশবার ফলে ধাতুভস্ম তৈরী হয়।

এছাড়া তিনি সর্বপ্রথম মৌলিক পদার্থের সুস্পষ্ট পরিচয় দেন, রাসায়নিক বিশ্লেষণে নতুন নতুন গ্যাস তৈরী করেন এবং কিভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে তার উপায়ও নির্দেশ করেন। রসায়ন বিজ্ঞানের স্রষ্টা বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ারের নির্দেশিত পথ ক্রমাগত অনুসরণ করে আজ রসায়ন বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে ৯২টি মৌলিক পদার্থের আবিষ্কার করেছেন।

আজীবন গবেষক, দৃঢ়চেতা, উদারপন্থী অমিতধর মহাবিজ্ঞানী, বিদ্রূপ, অবহেলা ও তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে রসায়ন বিজ্ঞানকে প্রগতির পথে যেভাবে এগিয়ে দিলেন তাঁকে একদিন এই পৃথিবীর মানুষেরা রসায়নের স্রষ্টা বলে রেহাই দেয়নি বরং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই মহান পুরুষকে বন্দী করে পৃথিবীর ত্রাণকর্তা ও মুক্ত পুরুষ যীশুর মতন নির্মম ভাবে গিলোটিনে হত্যা করেছিল। ইংরাজীর ৮ই মে, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দটি রসায়ন বিজ্ঞান ইতিহাস।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা !!

বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন নি

আমরা সবাই জানি যে বৃহস্পতির তেরোটা উপগ্রহ আছে। এই তেরোটার মধ্যে প্রধান চারটে উপগ্রহ হল 'ইও', ইউরোপা, গ্যানিমিড ও ক্যালিস্টো। এদের প্রথম আবিষ্কার করেন ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও ১৬১০ সালে। এই প্রচলিত ধারণায় একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তিনিই কি প্রথম জ্যোতির্বিদ যিনি ঐ চারটে উপগ্রহ প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন।

ইনস্টিটিউট ফর দি হিস্ট্রি অফ ন্যাচারাল সায়েন্সের অধ্যাপক জাই জে জোঙ্গ সম্প্রতি চৈনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও জ্যোতিপদার্থ পত্রিকায় বলেছেন গ্যালিলিওর বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কারের দু'হাজার বছর আগে খৃষ্টপূর্ব ৩৫৬ অব্দের গ্রীষ্মকালে তৎকালীন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যান ডে বৃহস্পতির গ্যানিমিড উপগ্রহটি আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রাচীন চৈনিক জ্যোতির্বিদ গ্যান ডে 'ট্রিটিস অফ জুপিটার' ও 'অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল প্রগনস্টিকেশান' নামে দুটো বই রচনা করেছিলেন। বর্তমানে অবশ্য ঐ বই দুটো হারিয়ে গেছে, কিন্তু ঐ বইএর কিছু অতিরিক্ত অংশ ৭১৮ থেকে ৭২৬ খৃষ্টাব্দে 'কোইয়ুয়ান ট্রিটিস' গ্রন্থে যুক্ত করা হয়েছিল। অধ্যাপক জাই জে জোঙ্গের তথ্য অনুযায়ী বলতে হয় খৃষ্টপূর্ব ৩৬৫ অব্দে গ্যান ডে বৃহস্পতির সবচেয়ে উজ্জ্বল উপগ্রহ গ্যানিমিড টেলিস্কোপ ছাড়া খালি চোখেই দেখেছিলেন। কিন্তু, আজও আমরা সঠিক ভাবে বলতে পারি না তিনি গ্যানিমিড দেখেছিলেন না ক্যালিস্টো দেখেছিলেন। তা যাই দেখুন না কেন এটা সত্যি যে গ্যালিলিওকে বৃহস্পতির উপগ্রহের প্রথম আবিষ্কর্তা বলাটা মনে হয় এখন আর ঠিক হবে না।

অ্যাকুমুলেটার :—

অল্প চাপের বিদ্যুৎশক্তি ধরে রাখার বিভিন্ন যান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি হল অ্যাকুমুলেটর। ব্যবহারের ফলে অ্যাকুমুলেটরের বিদ্যুৎশক্তি যদি কমে বা ফুরিয়ে যায় তাহলে পুনরায় চার্জ দেওয়া যেতে পারে।

উল্কাপাতের রহস্য :—

সূর্যের চার পাশে গ্রহগুলি ছাড়াও ছোট বড় অনেক শিলাখণ্ডও রয়েছে। এগুলির গতিবেগ ঘণ্টায় ২৩--৩০ মাইল।

পৃথিবীর কাছাকাছি এলে মহাকর্ষের টানে এরা পৃথিবীতে নেমে আসে। পৃথিবীর বায়ুস্তরে বাতাসের অণুগুলির সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এগুলো উত্তপ্ত এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মাটিতে পড়ার আগেই প্রায় ৪৫ মাইল উপরে উল্কা পুড়ে ছাই হয়ে যায়। গড়ে একটি উল্কা অত্যন্ত ছোট হয় তাদের গড় ওজন এক গ্রামের কয়েক হাজার ভাগ মাত্র।

বিজ্ঞান-বিচিত্রা

আগামী দশকে শিশুদের কোনো রোগ হবে না

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও আমেরিকা স্বাস্থ্য সংস্থা এক যৌথ উদ্যোগে একটা আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। এই আলোচনা সভায় বলা হয়েছে যে বর্তমানে বেশির ভাগ শিশুরাই হাম, পোলিও, ডিপথেরিয়া, টিটেনাস এবং হুপিং কাশিতে ভোগে। আগামী ১৯৯০ সালের মধ্যে এসব রোগের এমন কিছু প্রতিষেধকের কথা ভাবতে হবে যাতে আগামী দশকে শিশুদের মধ্যে এই জাতীয় রোগ আর না দেখা যায়। এ ব্যাপারে অন্যান্য রোগের সঙ্গে পোলিও এবং হুপিং কাশির প্রতিষেধকের ওপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন আজও প্রতি হাজার শিশুর মধ্যে একটির হাম হয় আবার এনকেফেলাইটিস রোগও দেখা যায়। অবশ্য সুখের খবর এই যে, চেকোশ্লোভাকিয়া, কোস্টারিকা এবং অ্যালবানিয়ার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন তাঁরা এই হামের এক অত্যাধুনিক প্রতিষেধক তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন ১৯৮২র অক্টোবর মাসের মধ্যে আমেরিকায় হামসংক্রান্ত কোনো রোগ থাকবে না বলে এই সভায় বলা হয়েছে। এর থেকে অনুমান করাটা কি অন্যায় হবে যে আগামী দশকে শিশুদের কোনো রোগ হবে না।

অ্যাকান্থোবডেলা :—

এক ধরনের ক্ষুদ্র পরজীবী প্রাণীর নাম। একমাত্র রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে পাওয়া যায়। মাছের পিছনের পাখনায় আটকে থাকে। জোঁকের মত সামনে ও পেছনে লেগে থাকে।

ফুলের পরী আমার শাকী

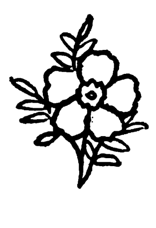
বিশ্বরূপ মণ্ডল

জাজিম জাজিম শুয়ে থাকি
উড়ছে ঘুড়ি আকাশ-পাখি
সিপাই ভায়া পরেছে খাকি
ফুলের পরী আমার শাকী।

জাজিম জাজিম শুয়ে থাকি
উড়ছে ঘুড়ি আকাশ-পাখি
পরেছি আমি শক্ত খাকি
ফুলের পরী খাকির শাকী।

জাজিম জাজিম শুয়ে থাকি
উড়ছে ঘুড়ি আকাশ-পাখি
পরণে ঘুড়ির পোষাক খাকি
ফুলের পরী ঘুড়ির শাকী।

জাজিম জাজিম শুয়ে থাকি
আমি ঘুড়ি আমিই পাখি
আমিই সিপাই পরেছি খাকি
ফুলের পরী আমার শাকী।





অদ্ভুত যতো গল্প

হেদায়েতুল্লাহ

সেবার আমরা যখন বদলি হ'য়ে খুলনায় গেলুম তখন আমার বয়স বোধ হয় ষোল কিংবা সতের হবে। যে বাড়িটা ঠিক হলো, সেটা একটা লালরঙের পুরনো দোতলা বাড়ি। তখন খুলনায় খুব বেশি ঘন বসতি ছিল না। বরং গাছপালা দিয়ে ঘেরা ছিল বাড়িগুলো। আমাদের সেই বাড়ির সামনে বিঘে খানেক ফাঁকা জমি ছিল। তাতে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ছিল। আমি থাকতাম একতলার একটা ঘরে। যার খোলা জানালা দিয়ে বাগানটা পুরো দেখা যেত। সেই বাগানে অদ্ভুত একটা আমগাছ ছিল। লম্বায় হয়তো ছ'সাত হাত হবে। দেহটা সরু আর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেড়ে উঠেছে। গাছের ছালটা যেন সাপের খোলসের মতো গা থেকে ছড়ে ছড়ে পড়ছে। গাছটার মাথা থেকে দুটো ডাল দুদিকে বেরিয়েই আবার নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে। প্রত্যেক ডালের আগা থেকে গোটা দশেক করে পাতা আঙুলের মতো ঝুলে পড়েছে। পাতার ধারগুলো কোঁকড়ানো। পাতাগুলোর রঙ ঠিক সবুজ নয়। কিছুটা হলদেটে। এরকম অদ্ভুত আমগাছ কোনদিন কোথাও দেখি নি। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় যখন ঘরের জানালা খুলে পড়তাম তখন বাতাসে গাছের ডাল দুটো নড়লে মনে হোত—সে আমাকে ডাকছে। যেন ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলতে চায়। গাছটার দিকে তাকালে একটা বিষণ্নতা ভিড় করে আসতো।

একদিন একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল। গাছটা যেন হেঁটে জানালা দিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। তারপর অস্পষ্ট স্বরে বললো—আমি আগের জন্মে মানুষ ছিলাম।

কলেজে আমার প্রাণের দোসর ছিল করিম। তাকে আমি আমার স্বপ্নের

কথা বললুম। তার আবার ভূত-প্রেত অলৌকিকত্বে বিশ্বাস খুব। সব শুনে টুনে সে বললো—চল। এক জায়গায় যাবি?

কোথায়?

চল। তোকে একটা আশ্চর্য জায়গায় নিয়ে যাব। সেখানে একটা অদ্ভুত বুড়ি থাকে। সে অনেক কিছু বলে দিতে পারে—ভূত, ভবিষ্যৎ, মানুষের স্বপ্ন।

পরদিন বিকেলের পড়ন্ত রোদে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ডাক-বাংলোর মোড় ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় এসে পড়লাম। সেই রাস্তা ধরে চলার কিছুক্ষণ পর একটা পুরনো মন্দিরের কাছে হাজির হলাম। মন্দিরের সামনে একটা ঘেরা ফুলবাগান। ঢোকার মুখে দুটো পাকা থাম। তাতে মড়ার খুলি আঁকা। বাগান পার হয়ে মন্দিরের সিঁড়িতে পা দিতে না দিতেই শুনি ফোঁস ফোঁস শব্দ। একটা ময়াল সাপ মাথা তুলে আমাদের দিকে ফোঁস ফোঁস করছে। করিম বললো—ভয় পাস্ না। দুটো পয়সা ফেলে দে। ও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মনে হলো, করিমের এখানে যাতায়াত আছে। দুটো পয়সা ফেলে দিতেই সাপটা গুটি সুটি মেরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমরা আস্তে আস্তে মন্দিরে উঠলাম। মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির সামনে একটা কালো পাথরের কালী মূর্তি। আলো আঁধারিতে কালী মূর্তির লাল জিবটা লক্‌লক্ করছে। মূর্তির সামনে একটা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের বুড়ি চোখ বুঁজে ধ্যান করছে। মাথার জট পাকানো চুল সাপের মতো অল্প হাওয়ায় উড়ছে। কপালে তিলক কাটা। পরনে গেরুয়া ধুতি। পাশে একটা ধুপদানে ধুপ জ্বলছে। পাশে একটা হাঁস বলি হয়ে পড়ে আছে। রক্ত একটা মাটির বাটিতে রাখা। পাশে চার পাঁচটা জবা।

আমরা দাঁড়িয়েই আছি। মিনিট পনের পরে ভৈরবী চোখ খুললো। তারপর সেই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে নিজের কপালে একটা ফোঁটা দিলো। আমাদের ইশারায় বসতে বলে, আমাদের কপালেও ঐ রক্তের ফোঁটা দিয়ে দিলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো—কি চাই?

আমি কিছু বলার আগেই করিম হাত জোড় করে বললো—আমরা একটা ব্যাপারে জানতে এসেছি।

বলো কি তোমাদের দরকার।

আমি সেই আমগাছ এবং আমার স্বপ্নের কথা বললাম। ভৈরবী আবার চোখ বুজে আসনে বসলো। বিড় বিড় করে কি সব বলতে লাগলো। প্রায় মিনিট দশেক পরে সে চোখ খুললো—

তোমার স্বপ্ন ঠিকই। ওই গাছটা পূর্বজন্মে মানুষ ছিল।

আমি হাঁ করে ভৈরবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

বাড়ি ফিরে আমার পড়ার ঘরে গেলুম। জানালা খুলে দিতে এক ঝলক দখিণের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘর ভরে উঠলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গাছটা যেন খুশিতে আমার দিকে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

এর চার পাঁচ দিন পরে, একদিন বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে গাছটার পরিচর্যা করতে গেলুম। ভাবলুম—গাছই হোক আর মানুষই হোক ওর তো প্রাণ আছে। গাছটাকে একটু যত্ন করলে একটু জল আর সার দিলে বোধ হয় বাড়তে পারে।

একটা কোদাল নিয়ে খুঁড়তে লাগলুম ওর গোড়া। বেশ কিছুক্ষণ খোঁড়ার পর

হঠাৎ কোদালে টং করে একটা শব্দ হোল। ভাবলুম বোধ হয় কোদালের মুখে কোন ইট কিংবা কাঠ পড়েছে। যা হোক সেটাকে তোলবার জন্য পাশে আরও গভীরভাবে কোপ দিতেই আবার শব্দ উঠলো—টং। কৌতূহলী হয়ে হাত দিয়ে মাটি সরাতে লাগলুম।

হঠাৎ হাতে একটা পচা লম্বা কাঠ ঠেকলো। আরও খুঁড়তে লাগলুম। বেরিয়ে এলো একটা লম্বা কাঠের বাক্স। হাত ছয়েক লম্বা আর হাত আড়াই চওড়া।

তড়ি ঘড়ি করে বাক্সের ডালাটা টেনে খুলতেই ভেতরের দৃশ্য দেখে আমার মাথা বোঁ করে ঘুরে গেল।

বাবা তখন সবে অফিস থেকে ফিরেছেন। আমি ডাকলাম—

বাবা! বাবা! শীগগির এদিকে এসো।

—কি রে? কি হোল?

বাবা তাড়াতাড়ি ছুটে এসে উঁকি মেরে দেখে বললেন—

—আরে কি আশ্চর্য! এটা তো মানুষের কংকাল। এভাবে এখানে কে রাখলো।

বাক্সের ডালাটা বন্ধ করলেন।

—তুমি এখানে থাক। আমি থানায় যাচ্ছি।

খুলনা থানার ও. সি. মিঃ রহমান আমার পরিচিত।

বাবাকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখে মা আমাকে ডাকতে ডাকতে বাইরে এলেন। আমাকে হতভম্বের মতো ব'সে থাকতে দেখে—

—কি রে খোকা! অমন করে বসে আছিস কেন?

—মাটি খুঁড়তে গিয়ে একটা কাঠের বাক্স বেরিয়েছে। সেই বাক্সের মধ্যে মানুষের হাড়গোড় রয়েছে।

—এ্যাঁ—কি সর্বনাশ! কি হবে এখন!

—চেঁচামেচি করো না। বাবা থানায় গেছে। এক্ষুণি এসে পড়বে।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা পুলিশের জীপ এসে থামলো। তার থেকে বাবা, ও. সি. মিঃ রহমান, সঙ্গে দু'জন কনস্টেবল নিয়ে নামলেন। বাবা আঙুল দিয়ে বাক্সটা দেখিয়ে দিলেন। একজন কনস্টেবল বাক্সের ডালাটা খুলে ধরলো।

সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা একটা কংকাল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে একটা সোনার আংটি। আংটির গায়ে খোদাই করা আছে S. S। আর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের হাড়গুলো নেই।

মিঃ রহমান বিভিন্ন দিক থেকে কংকালটার ছবি তুললেন। তারপর বাক্স সুদ্ধ লাশটা জীপের পিছনে তুলে দিলেন। পুলিশের জীপ আসতে দেখে আমাদের বাড়িতে একটা ছোটখাট জটলা দেখা গেল।

এমন সময়ে সেই জটলা থেকে একটা বুড়ো মতো লোক এগিয়ে এলো—

দারোগা সাহেব! আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

মিঃ রহমান বললেন—ঠিক আছে। আমি লোকজন সরিয়ে দিচ্ছি।

তিনি কনস্টেবলদের লোকজন সরিয়ে দিতে হুকুম দিলেন।

দারোগাবাবু ডাইরি আর কলম বের করলেন।

—আপনার নাম কি?

—সামসের আলি। পাশের বাসায় থাকি।

(৩৩ পৃষ্ঠায় দেখ)

রাজা শ্রীবৎসের গল্প

কিংশুক ভাদুড়ী

আজ থেকে বহুকাল আগের কথা। চিত্ররথ নামে সে সময়ে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ছিল শ্রীবৎস। রূপে গুণে শ্রীবৎস ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর গুণের খ্যাতি ছিল জগৎ জোড়া।

সেই সময় আর একজন রাজা ছিলেন চিত্রসেন। চিত্রসেনের ছিল রূপবতী কন্যা—নাম চিন্তা। চিন্তা যেমন ছিলেন রূপবতী তেমনি ছিলেন গুণবতী। শ্রীবৎসের বয়েস কাল উপস্থিত হলে রাজা চিত্ররথ চিন্তার সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন।

রাজা চিত্ররথ মারা গেলে শ্রীবৎস রাজা হলেন। তাঁর মতো ধার্মিক ও নানা গুণের অধিকারী সে যুগে আর কোন নৃপতি ছিল না। এমন কি দেবতারাও শ্রীবৎসের ওপর সন্তুষ্ট দিলেন।

একদিন লক্ষ্মী ও শনির মধ্যে পরস্পরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। লক্ষ্মী বললেন এ সংসারে আমিই বড় এবং শ্রেষ্ঠ। আমি যদি কাউকে দয়া না করি সে পথের ভিখিরি হয়ে যাবে।

শনি বললেন, না আমি শ্রেষ্ঠ। আমার কোপে পড়লে কারোর রক্ষে নেই। সে পথের ভিখিরি হবেই।

এই নিয়ে যখন তুমুল বিবাদ শুরু হল তখন দুজনেই মধ্যস্থতা মানলেন রাজা শ্রীবৎসকে। তাঁরা উভয়েই এসে শ্রীবৎসকে বললেন—শ্রীবৎস, তোমাকে ধার্মিক রাজা বলে সবাই জানে। তুমি আমাদের বিচার করে দাও, আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ।

রাজা শ্রীবৎস মহা চিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কি করে এই দেব দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করবেন। যাকেই শ্রেষ্ঠ বলবেন সঙ্গে সঙ্গে অপরজন অভিসম্পাত দেবেন তাঁকে। অনেকক্ষণ চিন্তা করে রাজা এক সপ্তাহের সময় নিলেন। বললেন, আপনারা আমায় মার্জনা করুন, এই মুহূর্তেই আপনাদের বিচার করতে পারছি না। আপনারা দয়া করে এক সপ্তাহ পরে আসুন।

এক সপ্তাহ ধরে চিন্তা করে রাজা দুটি সিংহাসন তৈরী করলেন একটি সোনার অপরটি রুপোর। সিংহাসন দুটি তৈরী করে রাজসভাতেই রেখে দিলেন তিনি।

যথা সময়ে নির্দিষ্ট সময় শেষ হলে লক্ষ্মী ও শনি উভয়েই এলেন বিচারের জন্য। শ্রীবৎস তাঁদের বসতে বললেন।

লক্ষ্মী গিয়ে বসলেন সোনার সিংহাসনে আর শনি গিয়ে বসলেন রুপোর সিংহাসনে। তারপর উভয়েই বললেন, এবার বল কে শ্রেষ্ঠ!

রাজা বললেন, আপনারা আমার বিচারের অপেক্ষা রাখেন নি। নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব নিজেরাই প্রমাণ করেছেন। আপনারা যে সিংহাসন দুটিতে বসেছেন তার একটি সোনার অপরটি রুপোর এবার আপনারা নিজেরাই যে যার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে নিন।

রাজার এই বিচারে শনি গেলেন রেগে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন ছেড়ে চলে গেলেন এবং লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করলেন রাজাকে।

শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে পরাজিত হয়ে শনি সব সময় চেষ্টা করতে লাগলেন যেমন করেই হোক ছলে বলে রাজাকে বিপদে ফেলতে। কিন্তু লক্ষ্মীর আশীর্বাদের দরুন কিছুতেই পেরে উঠছিলেন না। তবু চেষ্টা করে চলেছিলেন।

দৈবক্রমে একদিন হঠাৎ রাজা শ্রীবৎসের স্নান করার জলে একটা কালো কুকুর এসে মুখ দিল। শনি দেখলেন এই সুযোগ। রাজা সেই জলে স্নান করতেই শনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৎসের রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

শনির কোপে রাজ্যে শুরু হল ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি বন্যা মহামারী। লোকজন অকাতরে মরতে শুরু করলো। ধীরে ধীরে সমস্ত রাজ্য শ্মশানে পরিণত হতে শুরু করলো।

মনের দুঃখে শ্রীবৎস রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসী হওয়ার সংকল্প করলেন। রানী চিন্তাকে বললেন—আমার পাপে রাজ্যে আজ এ সব ঘটছে আমি বনে চলে যাবো। তুমি তোমার বাবার কাছে চলে যাও।

রানী চিন্তা রাজী হলেন না। বললেন, হে রাজন, স্ত্রীর ধর্মই হচ্ছে স্বামী। আপনি যেখানে যাবেন আমি সেখানেই যাবো।



তুমি কি অত কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

পারবো। আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনি আমায় আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।

অগত্যা রাজা রাজী হলেন। রাজা-রানী যখন রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন সেই সময় লক্ষ্মী এসে দেখা দিলেন তাঁদের। বললেন, তোমাকে অনেক রকম ভাবে শনির কোপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম শ্রীবৎস। কিন্তু তোমার সামান্য ভুলে আজ তোমার এই অবস্থা হল। যাক কিছুকাল তোমাদের গ্রহ ভোগ করতে হবে তারপর আবার তোমরা রাজ্য এবং তোমাদের ঐশ্বর্য্য ফিরে পাবে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রেখো হাজার দুঃখ কষ্টের নিপীড়নেও কখনো তোমরা ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট হবে না।

লক্ষ্মী অন্তর্ধান করলে রাজা রানী বনে গমন করেন। চলতে চলতে পথের মধ্যে শনির মায়ায় একটা মায়ানদী সৃষ্টি হয়। সেই নদী রাজা রানী পার হতে যান। রাজ্য ত্যাগ করার সময় শ্রীবৎস কতকগুলো বহুমূল্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়েছিলেন। নদী পার হতে গিয়ে শনির চক্রান্তে সেই সামগ্রীগুলো হঠাৎ তাঁদের হাত থেকে পড়ে যায়। এদিকে মায়া নদীও শুকিয়ে যায়।

পাঁচ বছর রাজা শ্রীবৎস ও রানী চিন্তা বনে বনে ফল মূল আহার করে কাটান। একদিন এক কাঠুরিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে কাঠুরিয়া তাঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। রাজা কাঠুরিয়াদের সঙ্গে থেকে বনে বনে কাঠ সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন।

একদিন রাজা বনে গেছেন কাঠ সংগ্রহে সেই সময় বাড়ির পাশে নদী দিয়ে নৌকো

নিয়ে যাচ্ছিল একদল বনিক। চিন্তাকে নদীর ঘাটে দেখতে পেয়ে তারা জোর পূর্বক অপহরণ করে নিয়ে গেল।

রাজা ফিরে এসে চিন্তাকে না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। তার পর যখন জানতে পারলেন চিন্তাকে বনিকরা ধরে নিয়ে গেছে তখন মনের দুঃখে সেই গ্রাম ত্যাগ করে চিন্তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুরতে ঘুরতে রাজা এসে উপস্থিত হলেন বাহু নামে এক রাজার রাজ্যে। থাকতেন এক মালিনীর কুটিরে।

একদিন তিনি শুনতে পেলেন বাহু রাজার কন্যার স্বয়ংবর সভা হবে। তিনি সেই স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হয়ে রাজকন্যা ভদ্রার পানি গ্রহণ করলেন।

দৈবক্রমে সেই সময় ঐ রাজ্যে চিন্তা সহ বনিকদের নৌকো উপস্থিত হলো। শ্রীবৎস জানতে পেরে বাহু রাজার সাহায্যে চিন্তাকে বনিকদের কাছ থেকে উদ্ধার করেন। আবার রাজা রানীর মিলন হল।

এদিকে শত চেষ্টাতেও শ্রীবৎস ও চিন্তাকে ধর্মপথ থেকে ভ্রষ্ট করতে না পেরে শনি শ্রীবৎসের উপর সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তখন রাজাকে বর দান করে বল্লেন, 'শ্রীবৎস, তোমার ধর্মনিষ্ঠা দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ করে দশ হাজার বছর অপ্রতিহত ভাবে রাজ্য ভোগ করবে। তোমার শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মাবে। তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও।

এরপর শ্রীবৎস চিন্তা ও ভদ্রাকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

(৩০ পৃষ্ঠার পর)

—বলুন। আপনার কি বলার আছে।

বুড়ো লোকটা বললো—দেখুন যার লাশ পেয়েছেন তার নাম শংকর সেন।

—কি করে বুঝলেন ?

—দেখুন। ওই যে আংটিতে লেখা রয়েছে S. S. অর্থাৎ শংকর সেন। আর ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুল ছিল না।

—আপনি ওকে চিনতেন ?

—চিনবো না ? ও আমাকে 'দাদু' 'দাদু' করে ডাকতো। আমার কাছে প্রায়ই আসতো। ও এই বাড়িতে কাকার সঙ্গে থাকতো। ওর বাপ মা কেউ ছিল না। বুড়োর দু'চোখে জল এসে গেল।

—মরার কিছুদিন আগে শংকর প্রায়ই বলতো। জানো দাদু ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়।

দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—ওরা মানে কারা ?

—শংকরের কাকা। শংকরের বাবার প্রচুর সম্পত্তি। কাকা শংকরকে মেরে সব কিছু একা পেতে চায়।

বাবা বললেন—কী নিষ্ঠুর।

—ওরা রটিয়ে দিলো, শংকর কলকাতায় পড়তে গেছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু প্রমাণ কই ? তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পুলিশ শংকরের কাকাকে ঢাকা থেকে অ্যারেস্ট করলো। সে নাকি সবকিছু স্বীকার করেছে।

আর সেই আমগাছটা। আস্তে আস্তে শুকিয়ে একদিন মারা গেল। আমগাছের গোড়া অনেকখানি খুঁড়ে ফেলা হয়েছিল বলে মারা গেল না অন্যকিছু ; আজও বুঝতে পারি নি।

শ্মশ্রু-গুম্ফ কথা

শৈলেনকুমার দত্ত

গত দু'শতাব্দীর ইতিহাসের পাতায় এবং মনীষীদের বিভিন্ন প্রতিকৃতিতে চোখ রাখলে বোঝা যায়, পৃথিবীর বহু দেশে গোঁফদাড়ির প্রচলন এবং সমাদর কি পরিমাণ ছিল। সভ্যতার মূল্যায়নে পরবর্তী কালে বর্জিত হলেও পৌরুষের প্রতীক এই বস্তু দুটি আবার নতুন করে ফিরে আসছে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মনীষীদের শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত বীরত্বব্যঞ্জক মুখাবয়ব দেখে আজও আমরা রোমাঞ্চ অনুভব করি। গুম্ফহীন স্যার আশুতোষের মুখ যেন কল্পনাই করা যায় না! রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ কিংবা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখও যেন কষ্টকল্পনা! কবি নবীনচন্দ্র তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের গোঁফ নিয়ে অনেক সরস মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—'সেই বুধমণ্ডলীর মধ্যে একটি ঋজু দীর্ঘকায় উজ্জ্বল কৌতুক প্রফুল্লমুখ গুম্ফধারী প্রৌঢ় পুরুষ।' পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য গুম্ফশূন্য হন।

পৃথিবীর ইতিহাসে অমর মনীষীদের মধ্যে কার্ল মার্ক্স, ফ্রয়েড, হুইটম্যান, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কি, জুলভার্ন, ব্রাউনিং প্রভৃতির গোঁফ-দাড়ি সুবিখ্যাত। বার্নার্ড শ' দাড়ি গোঁফের খুবই কদর করতেন। শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখে তিনি সবিস্ময়ে বলেছিলেন—এমন সিল্কের মত মসৃণ গোঁফ-দাড়িও মানুষের হয়। স্যার রিচার্ড টেম্পলের কাছে গোঁফ ছিল শ্লাঘার বস্তু। প্রচার ছিল তাঁর গোঁফ নাকি নেপোলিয়নের গোঁফের অনুকরণে রচিত হয়। বাংলাদেশে উমিচাঁদের দাড়ির কথাও একদিন কিম্বদন্তীর মত উচ্চারিত হত। চীন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক লাওৎসে সম্পর্কে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—জন্মের সময়েও নাকি তাঁর পাকা দাড়ি গোঁফ ছিল।

শ্মশ্রুগুম্ফ নিয়ে অনেক ঘটনাও আছে বিশ্ব ইতিহাসে। রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট দাড়ির ওপর ট্যাক্স বসিয়েছিলেন। রোম-সম্রাট ক্যালিগুলা জুপিটারের মত সোনার দাড়ি পরতেন। দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁর সমস্ত সৈন্যের দাড়ি কেটে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, দাড়ি ধরে টানলে মানুষ সহজে কাবু হয়।

শুধু মাত্র দাড়ি গোঁফের জন্যই বিখ্যাত হয়েছেন, পৃথিবীতে এমন নজীরও আছে। জাপানী সেনাপতি জেনারেল নাগা সুবিখ্যাত ছিলেন তাঁর বিরাট গোঁফের জন্যে। নরওয়ের হ্যান্স ল্যানেমেত নামে এক ব্যক্তি ছত্রিশ বছর এক নাগাড়ে দাড়ি না কামিয়ে প্রায় সাড়ে এগার ফুট লম্বা দাড়ি বানিয়েছিলেন। উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার মাসুরিয়া দিন নামে এক ব্যক্তির গোঁফ ছিল ছ'হাত লম্বা।

কবি সুকুমার রায় একবার গোঁফ চুরির কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব জগতে এটা কতখানি সম্ভব ? তাও একবার সম্ভব হয়েছিল। রিপ্লে সাহেবের আজব খবরে আছে—ফরাসী বিদ্রোহের সময় এক সৈনিক রাজা হেনরির মৃতাধার থেকে গোঁফ চুরি করে একুশ বছর ধরে একনাগাড়ে পরেছিলেন। প্রকৃতিদত্ত এই বস্তু দুটি থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন।

বাঙলা সাহিত্যেও গোঁফ-দাড়ির অনেক প্রসঙ্গ আছে। অমৃতলাল বসুর প্রহসন 'তাজ্জব ব্যাপার' এবং অবনীন্দ্র-নাথের 'একে তিন তিনে এক' গ্রন্থে গোঁফের কথা আছে। সবচেয়ে বিখ্যাত হল দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গুম্ফ আক্রমণ কাব্য'। রাজনারায়ণ বসুর 'গোঁফ-দাড়িকে কেন্দ্র করে রচিত এই সরস কাব্যটি সত্যিই উপভোগ্য। রাজনারায়ণের গোঁফ নিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

গোঁফ তাঁর অমায়িক ছাপিয়াছে দুই দিক
শ্বেতবর্ণ এই অপরাধ।

তাই তিনি ঐ বর্ণ পরিবর্তনের জন্য কলপের পোঁচ দিতে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন—

অনায়াসে হবে ধন্য যুবামধ্যে অগ্রগণ্য
বয়ঃক্রম ঊনিশ কি বিশ।

কবি নিজেও ছিলেন গুম্ফধারী। তবে রাজনারায়ণের গোঁফের তুলনায় তা কেমন সেকথা জানাতেও তিনি ভোলেন নি—

আমার এ গোঁফখানি
এ তো অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী
তোমার উহার তুলনায়।

'গুম্ফ আক্রমণ কাব্য' এইসব নির্মল রঙ্গ রসিকতায় পূর্ণ। কবি শেষ পর্যন্ত এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন—

পড়ে যেই লোক এই শ্লোক
পায় সে গুম্ফলোক ইহার পরে
যথা গুম্ফধারী ভারীভারী
গোঁফের সেবা করি সুখে বিচরে।



দুরন্ত দুংরাজ

[আগে যা ঘটেছে ঃ—দুংরাজ নিজের ভুলেই আবার দস্যুদের কবলে পড়ল। তাকে বন্দী করে রাখা হল গভীর জঙ্গলের ভিতরে একটি ঘরে। সেখানে আরও তিনজন বন্দীকে দেখতে পেল। ডাকাতরা রাস্তা মেরামত করার একটি কনট্রাকটার কোম্পানীর টাকার সন্ধান জানবার জন্য লোক তিনটিকে আটক রেখেছিল। কথা ছিল নির্দিষ্ট দিনে তাদের সঙ্গে নিয়ে সেই কোম্পানীর তাঁবুতে গিয়ে টাকা লুঠ করবে। দুংরাজ তা জেনে নিয়ে আগের দিন রাত্রেই সেখান থেকে পালিয়ে গেল।]

॥ ৮ ॥

যে সব ডাকাতরা বন্দীদের খাবার দিতে এসেছিল, কিছুক্ষণ পর তাদের মনে পড়ল দুংরাজকে তারা ভুলে ঠিক ভাবে বেঁধে রেখে আসে নি। তাই তারা আবার ফিরে এল। কিন্তু এসে দেখল দুংরাজ নেই। সে পালিয়ে গেছে।

ডাকাতরা হৈ-চৈ করতে লাগল। কোথায় পালাল লোকটা ?

বন্দী তিনজনকে তারা জিজ্ঞেস করল, তোমরা দেখেছ, লোকটা কোথায় গেল ? কোন দিক দিয়ে পালাল ?

বন্দীরা বলল, আমরা জানি না।

ডাকাতরা তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলল—তোমরা জান না, তা হতেই পারে না। তোমাদের চোখের সামনে থেকে পালিয়ে গেল আর তোমরা দেখলে না ? বল, নইলে তোমাদের শাস্তি দেব।

বন্দীরা বলল—তোমরা তাকে ভাল করে বেঁধে রেখে যাওনি, তাই সে ঐ গাছের ডাল বেয়ে পালিয়ে গেছে।

ডাকাতরা তখনই হৈ-হল্লা করে চারি-

দিক খুঁজে বেড়াতে লাগল। এই অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় যাবে লোকটা? কিন্তু অন্ধকারে ঐ ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

কেটে গেল একটা দিন।

পরের দিন সন্ধ্যার একটু পরেই সেই জঙ্গলের বন্দীশালার সামনে হাজির হল অনেক ডাকাত। তারা আজ বন্দী মজুরদের নিয়ে যাবে সেই কনট্রাকটার কোম্পানীর তাঁবুতে। সেখান থেকে লুট করে আনবে টাকা।

ডাকাতরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। সর্দার স্থানীয় দু'জনের সঙ্গে আছে বন্দুক আর অন্যদের কারুর হাতে তলোয়ার, কারুর হাতে বল্লম।

ডাকাতরা ফিস্ ফিস্ করে কি যেন পরামর্শ করল। তারপর এগিয়ে এল বন্দীদের কাছে। তিনজনের বাঁধন তারা খুলল না। একজনের বাঁধন খুলল। সেই একজনকে সঙ্গে নিয়েই তারা রওনা হল। বাকি দু'জনকে তারা রেখে গেল জিম্মা হিসাবে। টাকা লুট করে আনার পর এই দু'জনকে ছেড়ে দেবে।

রওনা হল ডাকাতদল।

বনজঙ্গল পেরিয়ে তারা ফাঁকা জায়গায় এসে পেঁছিল।

একটি পুলের কাছে আসতেই বুঝতে পারল ঠিক জায়গাতেই তারা পেঁছিছে।

বনজঙ্গল না থাকলেও পথঘাট সব অন্ধকার। চারদিক ভাল করে দেখা যায় না। সেই অন্ধকারের মধ্যেই তারা পুল পেরিয়ে তাঁবুর কাছে এসে পেঁছিল।

নির্জন তাঁবু। সেখানে কোন লোক-জন জেগে নেই। তা ছাড়া তাঁবুতে কোন লোকজন আছে বলেও মনে হয় না। বড় তাঁবুটি একটু দূরে। সেটাই কোম্পানীর অফিস। ঐ তাঁবুরও কোন লোকজন জেগে নেই।

ডাকাতদের মনে কিরকম সন্দেহ জাগল। বন্দী মজুরটিকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল—এটাই তোমাদের অফিস তো?

মজুরটির মনেও কেমন যেন সন্দেহ হল। তবে কি কোম্পানীর কাজকর্ম এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে? সে একটু থতমত খেয়েই জবাব দিল—হ্যাঁ, এটাই অফিস!

ডাকাতরা বলল—আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

মজুরটি ডাকাতদের বড় তাঁবুর ভিতর ঢুকতে বলল।

ডাকাতরা বড় তাঁবুর ভিতর ঢুকে বন্দী মজুরটিকে বলল—কোথায় টাকা পয়সা আছে আমাদের দেখিয়ে দাও।

কোম্পানীর সিন্দুকটা কোথায় আছে তা মজুরটি জানত। অন্ধকারের মধ্যেও তা অনুমান করে ডাকাতদের নিয়ে সে অগ্রসর হতে লাগল। তাঁবুটা বেশ বড়। ভেতরে জিনিসপত্রও অনেক। লাইনে লাইনে খাটিয়া পাতা এবং ঝাঁকে ঝাঁকে বাক্স পেঁটরা। সেদিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা এগিয়ে যেতে লাগল। ডাকাতরা অবাক হয়ে গেল একটি ব্যাপার দেখে। কোন খাটিয়াতেই লোকজন শুয়ে নেই। অন্ধকারের মধ্যেও তারা তা স্পষ্ট বুঝতে পারল।

সিন্দুকের কাছে এসে পেঁছিল তারা। সিন্দুকটা নেহাত ছোট নয়। শহর থেকে দূরের এই জঙ্গলের তাঁবুতেও কোম্পানীর লোকেরা কাজকর্ম ও টাকা পয়সা রাখার সুবিধার জন্য সিন্দুকটি বয়ে এনেছে।

সিন্দুকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন-চারজন ডাকাত। অন্যান্য সব ডাকাতরা দূরে রয়েছে। সিন্দুকের সামনে দাঁড়িয়েও কোন লাভ হচ্ছে না তাদের। চাবি না পেলে সিন্দুক খুলবে কি করে। কার কাছে চাইবে সিন্দুকের চাবি? লোক কোথায়? লোক পেলে ভয় দেখিয়েও সিন্দুক খোলানো যেত। কিন্তু এখন?

কি করা হবে তাই নিয়ে ডাকাতরা মুস্কিলে পড়ে গেল। তারপর স্থির করল সকলে মিলে সিন্দুকটাই ভাঙবার চেষ্টা করবে। তাই সিন্দুকের কাছে যে ডাকাতরা ছিল তারা অন্যান্য ডাকাতদের কাছে যাবার জন্য ডাকল।

খাটিয়ার পাশ দিয়ে এবং বাক্স পেঁটরার ঝাঁক ঘুরে ডাকাতরা সিন্দুকের দিকে এগোতে লাগল। আর তখনই ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড। ধপাধপ ডাকাতরা হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু যেখানেই তারা পড়ল সেখানেই অন্ধকারের মধ্যে আর একজন লোক দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল।

সেই সব লোকই বা কে?

ডাকাতরা বিস্মিত ও ভীত হয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারা গেল যে খাটিয়াগুলি শূন্য ছিল সেই খাটিয়া-গুলির তলা থেকেই লোকগুলি আবির্ভূত হচ্ছে। এ যেন ভৌতিক ব্যাপার।

শুধু তাই নয়। বাক্স পেঁটরাগুলি যে ভাবে ঝাঁক ঝাঁক করে উঁচু করে রাখা হয়েছিল তারও আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে ছিল কিছু লোক। তারা সুযোগ বুঝে বেরিয়ে এলো। সবার হাতেই কোন না কোন অস্ত্র।

যে সর্দার স্থানীয় ডাকাত দুজনের হাতে বন্দুক ছিল, আড়ালে থেকে কোম্পানীর লোকেরা লক্ষ্য করছিল তাদের গতিবিধি। এবার সুযোগ বুঝে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ডাকাত দুজনের উপর। বন্দুক দুটো কেড়ে নিল।

অন্ধকারের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল এবার খণ্ডযুদ্ধ।

ডাকাতরা ভাবতে পারে নি এমন ব্যাপার ঘটবে। তারা এবার পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সর্দারের নির্দেশে তারা বেরিয়ে পড়ল তাঁবু থেকে, তারপর ছুটতে শুরু করল। যে মজুরটিকে তারা সঙ্গে করে এনেছিল তাকে টেনে নিয়ে যেতেও ভুল করল না। এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য হল পালিয়ে বাঁচা।

মজুরটি কিন্তু তাদের সঙ্গে যেতে চাইল না। তখন তাকে নিয়ে দু'তিনজন ডাকাত টানাটানি করতে লাগল। এমন সময় তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন কোম্পানীর একজন জোয়ান জবরদস্ত লোক। তাঁর হাতে বন্দুক। অন্ধকারে তিনি ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি বন্দুক ছুড়লেন। দৌড়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একটি লোক। কিন্তু কোম্পানীর লোকটি বুঝতে পারলেন না নিজেদের লোককেই তিনি হত্যা করেছেন।

ডাকাতরা মজুরের মৃতদেহ ফেলেই ছুটে পালিয়ে গেল।

ডাকাতরা ছুটছে তো ছুটছেই।

(চলবে)

উপস্থিত বুদ্ধি

শ্রীনির্মাল্য প্রসাদ ভৌমিক

দিনের আলো প্রায় নিভে এসেছে। গেস্ট হাউজে ফিরে রজত হাঁক দিল, আব্দুল।

শীর্ণ, খর্বদেহের একটি পক্বকেশ মানুষ এসে উঠোনে দাঁড়াল। রজতের ডানহাতের দিকে তাকিয়ে তার শমশ্রুগুম্ফ শোভিত মুখে এক টুকরো হাসি ফুটে ওঠে; এই শিকার কোথায় মিলল সাহেব?

কারখানার ধারে ঐ পুষ্করিণীটা আছে না! বর্ষার জলে ভরে গিয়ে আশে পাশে উপচে পড়েছে। সেখানে অনেক বক এসে জুটেছে। এটা ছিল সব থেকে পুষ্ট। যাক, চা লাগাও তারপর এটাকে বেশ করে রোস্ট বানাও, রাত্রিতে খাওয়া যাবে। কারখানার ম্যানেজার আসছে। রাত্রিতে সেও খাবে।

ইতিমধ্যে কারখানার ম্যানেজার এসে পড়েছে। স্নান সেরে গেস্ট হাউজের দোতলার বারান্দায় তাকে নিয়ে রজত কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। গেস্ট হাউজটি শহরতলীর এক প্রান্তে। আশ-পাশের তেমন উন্নতি এখনও হয়নি, মাটির রাস্তা। ইলেকট্রিক লাইন টানা আছে বটে কিন্তু পথে আলো নেই। সন্ধ্যার পরে পরেই যেন নিশুতি রাত্রির অন্ধকার। ঝিঁঝির একটানা কলতানে সে অন্ধকার যেন আরও জমাট। মাঝে মাঝে জোনাকির বুটি।

দোতলায় চা পাঠিয়ে, বকটাকে সাফ সুরুত করে, মসলা মাখিয়ে আব্দুল কড়ায় চাপিয়েছে এমনি সময় পেছন থেকে কার ডাক ভেসে আসেঃ আব্দুল ভাই আছো?

কে? খালেক! একটু দাঁড়াও ভাই।

অনেকটা হাওয়া নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে আগন্তুক বলেঃ ভারি ওমদা খুসবু তো! কি পাকাচ্ছ?

আব্দুলের চোখ কিন্তু কড়ার উপর স্থিরঃ সেন সাহেব একটা বক শিকার করেছে। রোস্ট বানাচ্ছি। প্রায় হয়ে এসেছে। সামান্য অপেক্ষা করো, কথা আছে।

আমায় একটু দেবে? ভারি লোভ হচ্ছে।

আরে ব্যাস, সেন সাহেবকে জানো না, যা রাগী আমায় গুলি করে দেবে। এই যে আমার কাজ শেষ।

কড়া নামিয়ে কি আনতে আব্দুল উঠে গেছে। খালেক অমনি কড়া আর পাশে রাখা ছুরি নিয়ে হাওয়া। কড়া যখন ফিরে পেল তখন বকের একটি ঠ্যাংও হাওয়া।

তুমি এ কি করলে খালেক। আমি এখন কি করি।

পরিস্থিতি সঙ্গীন বুঝে খালেক পালিয়ে গেল। ভেবে ভেবে বুড়ো আব্দুল আর হালে পানি পায় না! ধুস, নসিবে যা আছে হবে। আব্দুল বাকি কাজ করে যেতে লাগল।

রাত্রিতে যথাসময়ে খাবার টেবিলে রজত ও কারখানার ম্যানেজার বসেছে। রোস্টের প্লেটের দিকে তাকিয়ে রজতের ভ্রূ কুঞ্চিত হলঃ আব্দুল!

আব্দুল ধীরে সুস্থে এসে দাঁড়ালঃ সায়েব!

রোস্টের একটা ঠ্যাং কেন?

বকের একটা ঠ্যাং থাকে, তাই।

কি? রজত নিজের কান যেন বিশ্বাস করে না, মাথা ঝাঁকিয়ে শুধোয়ঃ কি বললে?

যা সত্যি তাই বলেছি সায়েব। বকের একটা ঠ্যাং না?

তোমার কি মাথা খারাপ হল আব্দুল? কোন পাখির একটা ঠ্যাং হয়? কি যা-তা বকছ। এই বকটার কথা ছাড়ো। আমি আর কোন বক দেখিনি?

জানি নে সায়েব, তবে আমি সত্যি কথা বলেছি। প্রমাণ দিতে পারি।

অবাক বিস্ময়ে রজত কয়েক মুহূর্ত আব্দুলের বলিরেখাঙ্কিত, শান্ত মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আব্দুলের সততা সম্বন্ধে তার সন্দেহ নেই। সে বাবার আমলের লোক। কারখানার ও গেস্ট হাউজের পত্তন থেকে আছে। স্বভাবে শান্ত, ধীর এবং বুদ্ধিমান এই বুড়ো মানুষটিকে রজত ভালো করেই চেনে। কিন্তু আব্দুলের ব্যবহারে আজ এই আশ্চর্য ব্যতিক্রম কেন? কোথাও কিছু একটা গোলযোগ হয়েছে। তীক্ষ্নবুদ্ধি রজত সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু ডাহা মিথ্যে গোঁজা দিয়ে তা লুকোতে চাইছে কেন? আব্দুলে স্বার্থ কি? এ সব ক্ষেত্রে সত্য কথা বার করার পদ্ধতি রজতের জানা আছে কিন্তু সাধারণ, সামান্য বিষয় নিয়ে ম্যানেজারের সামনে একটা দৃশ্যের অবতারণা রজতের রুচিতে বাধে। একটু বাদে দুর্দমনীয় ক্রোধ অতি কষ্টে সামলে ধীরে ধীরে বলে: বকের একটা ঠ্যাংহয় তুমি প্রমাণ দিতে পার তাই না?

জী, সায়েব।

ঠিক আছে। এই রাতে আর কোথায় যাবো। তবে কাল ভোরে তুমি প্রমাণ দেবে। প্রমাণ না হলে কঠিন শাস্তি দেব, মনে থাকে যেন।

আব্দুল নিঃশব্দে মাথা নাড়ে।

কাজকর্ম সেরে বিছানায় শুয়ে আব্দুলের নিজের উপর খুব রাগ হতে থাকে। সদাহাস্যময়, দিলখোলা রজতের থমথমে মুখ অন্ধকার ঘরেও তার চোখের সামনে আলোড়িত হতে থাকে। সে যে বিলক্ষণ চটেছে সন্দেহ নেই। সেজন্য তাকে দোষও দেওয়া যায় না। চটে যাবার মত কথাই বটে। এমন জলজ্যান্ত মিছে কথা না বলে সহজ সরল সত্য কবুল করলে কি ক্ষতি ছিল? এখন উপায়? অনেকক্ষণ ছটফট করে অবশেষে সে ঘুমিয়ে পড়ে।

এক সময়ে ধড়ফড় করে সে জেগে ওঠে। কে ডাকে? সায়েব নিশ্চয়ই নয়, কারণ সকাল বেলায় দেরী করে ওঠা রজতের স্বভাব। জানালা দিয়ে দেখা যায় অন্ধকার আর নেই বটে তবে দিনের আলোও তেমন স্পষ্ট নয়। দরজা খুলে বাইরে এসে অবাক। স্বয়ং রজত দাঁড়িয়ে। সেই অস্পষ্ট আলোয়ও রজতের উস্কো-খুস্কো অবিন্যস্ত চুল, লালচে চোখ, থমথমে মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পায়—ষষ্ঠ চেতনা দিয়ে অনুভব করে যে রজতও গতরাত্রে ভালো করে ঘুমোয়নি। কিন্তু কথা একবার বলে ফেলে তা কি আর ফিরিয়ে নেয়া যায়? তবুও অস্বস্তির



পরিস্থিতি একটু হাল্কা করে নেবার প্রয়াসে সে অভিবাদন জানায়।

সেলাম সাহেব !

কিন্তু রজত সহজ হতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে না। থমথমে মুখের মত ভারি গলায় বলেঃ কাল কি কথা হয়েছিল মনে আছে ? চলো।

যন্ত্রচালিতের মত আব্দুল রজতের পিছু পিছু এগিয়ে যায়। কারখানা এবং তৎসংলগ্ন পুষ্করিণী গেস্ট হাউজ থেকে বেশি দূরে না। মিনিট দশেকের মধ্যেই পুষ্করিণীর আভাস চোখে পড়ে। আরও কয়েক পা এগিয়ে রজত থামে।

অনেক বক দাঁড়িয়ে আছে দেখেছ ? আব্দুল নিঃশব্দে ইতিবাচক মাথা নাড়ে। তার প্রাণের দায়। যা দেখার ঐ অস্পষ্ট আলোয় সমগ্র চেতনা একত্র করে সে ইতিমধ্যে দেখে, চকিতে, রজতের অলক্ষ্যে একবার পশ্চিম দিকে মুখ করে খোদার দোয়া মোনাজাত করে নিয়েছে। রজতের বরং ভাল করে দেখা দরকার।

এখন তোমার কথা প্রমাণ কর—রজতের গলা পূর্ববৎ গম্ভীর।

প্রমাণ আপনার সুমুখেই হাজির—আব্দুল যেন নির্বিকল্প।

মানে ?—রজত সক্রোধে জবাব দেয়।

দিনের আলো এখন আরও একটু স্পষ্ট—বকগুলোও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেক বক—একপায়ে দাঁড়িয়ে অর্থাৎ ঘুমুচ্ছে। বক একপায়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়।

দেখুন, সব বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়োটার হল কি, ভিমরতি ! নাকি, ভাঙবে তবু মচকাবে না। সেই কাল রাত থেকে এক গোঁ ধরে আছে। রাগে রজতের ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে উঠে। না, এখন রাগলে চলবে না। বুড়োকে আগে চিত করে ফেলে ঢিট করতে হবে। প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে রজত জবাব দেয়, সব এক পায়ে দাঁড়িয়ে, তাই না, এবারে দেখো ! তারপর সে পুষ্করিণীর দিকে আরও একটু এগিয়ে, দুহাতে তালি বাজিয়ে "হুঁস" "হুঁস" শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত বকগুলো তটস্থ হয়ে দ্বিতীয় পা নামিয়ে, দুপায়ে সামনের দিকে একটু হেঁটে পাখার হু হু শব্দ তুলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। তখন দুটি পা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

আব্দুল, বকের তাহলে দুটি পা, কেমন ? তোমার কিছু বলার আছে ?

শুধু একটি কথা, বকগুলো এক-পায়েই দাঁড়িয়ে ছিল। আপনি "হুস" "হুস" শব্দ করলেন। ওরা লুকনো পাটা নামালো। ঠিক ?

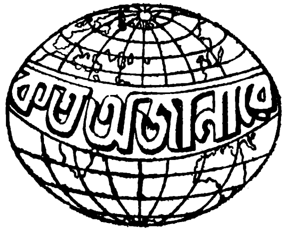
তাতে কি বোঝায় ওদের একটি পা ?

তা নয়, কিন্তু কাল খেতে বসে আপনি কি "হুস" "হুস" শব্দ করেছিলেন ?

মানে !—রজতের ভ্রূ কুঞ্চিত —কণ্ঠস্বরে ক্রোধ ব্যক্ত।

রাগ করবেন না সাহেব ! আব্দুল নির্বিকার, শান্ত স্বরে জবাব দেয়- মেহেরবানী করে যদি করতেন তাহলে কাল রাতে ওই প্লেটের বকটা এই বকগুলোর মত লুকনো পা দেখিয়ে দিত আর মামলারও ফয়সালা হয়ে যেত।

ইতিমধ্যে ভোরের স্নিগ্ধ, নরম, মিষ্টি, হাল্কা আলোয় চারদিক ভরে গিয়ে পূব আকাশ একখানা ছবির মত দেখাচ্ছে। রজত কয়েক মুহূর্ত জুল জুল করে আব্দুলের দিকে চেয়ে থেকে অকস্মাৎ হো হো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। দূরের ঐ চকচকে আকাশের মত সায়েব আবার স্বাভাবিক ঝকঝকে চেহারায় ফিরে এসেছেন -একটা সুদীর্ঘ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আব্দুল স্মিত মুখে রজতের দিকে তাকিয়ে থাকে।...



ব্যয়বহুল শহর

ব্যয়বহুল শহর? কেন, নিউইয়র্ক, লণ্ডন বা প্যারিস।—সবারই এরকম একটা ধারণা আছে, ঠিকই। কিন্তু গত এপ্রিলে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বিজনেস ইন্টারন্যাশন্যাল কর্পোরেশনের সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ১৯৮১র পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহর হচ্ছে নাইজেরিয়ার রাজধানী লাগস। জাপানের রাজধানী টোকিও রয়েছে তার ঠিক পরেই। তৃতীয় স্থানে আছে নরওয়ের ওসলো শহর। আর নিউইয়র্ক, লণ্ডন বা প্যারিস এরা রয়েছে অনেক পিছনে।

গীনিজ বই-এ দুজন ভারতীয়

পৃথিবীর রেকর্ড সংকলিত গীনিজ বই-এর পরবর্তী সংস্করণে রেকর্ড সৃষ্টিকারী দুজন ভারতীয়র নাম তালিকাভুক্ত হতে চলেছে। একজন হলেন কেরালার প্রেমনাজির। ৫৫০টি মালয়ালম ছবিতে অভিনয় করে তিনি এই রেকর্ড গড়েছেন। দ্বিতীয়জন হলেন প্রখ্যাত সরীসৃপবিদ টম নামবি। তিনি এক গর্তে সবচেয়ে বিষাক্ত সাপের সঙ্গে বেশিক্ষণ সময় কাটিয়ে এই রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

নতুন জেলা

গত ১৫ই এপ্রিল রাজস্থানে ধোলপুর নামে এক নতুন জেলা গঠিত হল। সুতরাং বর্তমানে রাজস্থানে মোট জেলার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ২৭-এ।

আজব কারখানা

দুনিয়ার কারখানায় বাঘা বাঘা যন্ত্রবিদরা যত মজবুত ইঞ্জিন তৈরী করেছে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে চার চেম্বারের চার ভাল্বের পাম্প মানুষের হৃৎপিণ্ড। বিশেষ এক চলাচল ব্যবস্থার সাহায্যে রক্তস্রোত প্রতিদিন পাঁচশো গ্যালন হারে বারো হাজার মাইল লম্বা পথ পরিক্রমা করে। কোন রকম মেরামতি ছাড়াই জীবদ্দশায় এই হৃৎপিণ্ড ২,৫০০,০০০,০০ বার স্পন্দিত হয়।

সমুদ্রের মৃত্যু

সম্প্রতি মিশিগান বিদ্যালয়ের একদল গবেষক এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে শুক্রগ্রহের বিরাট সমুদ্রটি শুকিয়ে গেছে। সমুদ্রটির গভীরতা ছিল আড়াই কিলোমিটার। যে কারণে সমুদ্রটি শুকিয়ে গেছে, তা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'গ্রীন হাউস এফেক্ট' বলা হয় সূর্যের তাপ আবহমণ্ডলে জমে যার ফলে গ্রহের জল উত্তপ্ত হয়ে কার্বনডাই অক্সাইডের ঘন স্তরে পরিণত হয়। যদিও পৃথিবী আর শুক্রের বিবর্তনের ইতিহাস ঠিক একরকম নয় তবুও আশংকা হয় একদিন পৃথিবীর সমুদ্রগুলিও শুকিয়ে যাবে না তো?

পায়ে হেঁটে হিমালয় পার

সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাঁচজন সৈনিক পায়ে হেঁটে হিমালয়ের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করেছেন। ৮০০ কি. মি. এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে সময় লেগেছে প্রায় ৬ মাস। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পর্বত অভিযান এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। দলটি ১৫ই জানুয়ারি যাত্রা শুরু করেছিল আর অভিযানের সমাপ্তি ঘটে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ।

হানাবাড়ির রহস্য---উজ্জ্বল ও প্রোজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়




এখান দিয়েই গেছে।
সিঁড়ি দেখছি, চলে আয় অঞ্জু।
সাবধানে নাম।
ঐ দ্যাখ!
কালকেই চার বস্তা মাল ডঃ বড়ালের কাছে পৌঁছে দিতে হবে...
আর কোন কাজ নেই?
হ্যাঁ, মাল পৌঁছে দিয়ে তুই আর আমি ১নং ঘাঁটিতে চলে যাব।
আমায় কী করতে হবে?

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য



স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বপ্রকাশিতের পর]

এই পাহাড়ের অংশটির ঠিক নীচে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য।

সেখানে এক লড়াই চলেছে। কিন্তু এ ধরনের লড়াই আজ পর্যন্ত কোন মানুষ কোনদিন দেখে নি। আশ্চর্য, অমানুষিক যুদ্ধ।

ক্যাপটেন সিং তাঁর সশস্ত্র লোকজন সঙ্গে নিয়ে ঘিরে ফেলেছেন গুহার সামনেটা। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর প্রহরীর দল গুহার এদিকে পাহাড়ের আড়াল থেকে তাদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছে। কিন্তু সংখ্যায় তারা মাত্র কয়েকজন।

কিন্তু এই সঙ্গে তেড়ে গেছে সেই বিশাল আকৃতির ডাইনোসরটা।

মাটির ওপর ল্যাজ আছড়ানোর প্রচন্ড শব্দ সেই সঙ্গে বিকট গর্জনে প্রাগৈ-তিহাসিক ডাইনোসরটা যেন প্রতি মুহূর্তে ভূমিকম্প ও বজ্রপাত ঘটিয়ে চলেছে।

প্রবল বিক্রমে সে একাই বাধা দিয়ে চলেছে ক্যাপটেন সিং-এর দলবলকে। ক্যাপটেন সিং-এর গুহা প্রবেশের ইচ্ছাকে সে সর্ব শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করে চলেছে।

কিন্তু সে জানোয়ার! হোক না বিশাল অসুর শক্তির অধিকারী—তবু মানুষ তার চেয়ে অনেক কৌশলী, হিংস্র।

প্রতি মুহূর্তে সে আরও বেশি আহত হয়ে চলেছে। ক্যাপটেন সিং-এর দল বন্দুকের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে তার পর্বতপ্রমাণ শরীরটা।

তার গর্জন এখন ক্রমেই আর্তনাদের রূপ নিচ্ছে কিন্তু তবু পিছু হটতে সে রাজী নয়।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই আশ্চর্য লড়াই। দশ কোটি বছর আগের এক প্রাগৈতিহাসিক জীব তার জীবনদাতার জীবনের রক্ষাকবচ হয়ে তার অন্নের ঋণ শোধ করে চলেছে। যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ একজন আক্রমণকারীকে ও ল্যাবরেটারী গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে দেবে না।

হু হু করে রক্ত ঝরছে ডাইনোসরের শরীর দিয়ে। দুর্বলতায় টলে টলে পড়ছে।

তবু পালাতে সে জানে না। দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীতে এই কি লড়াই-এর রীতি? আমৃত্যু সংগ্রাম।

ক্যাপটেন সিং-এর দলের একজন বোধ হয় একটু বেশি সাহসী হয়ে দল ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসেছিল। ডাইনোসরটা মুহূর্তে তাকে মুখে তুলে নিল। তারপর তার প্রাণহীন ছিবড়ানো দেহটা আছড়ে পড়লো পাহাড়ের গায়ে।

ড্রাগন পাহাড়ের ড্রাগন দেবতার বাহন এবার প্রচণ্ড ক্ষেপে গেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে ক্যাপটেন সিং-এর দলকে। দেখতে দেখতে আরও একটা দেহ মুখে করে তুলে নিয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলে দিল পাহাড়ের গায়ে।

হঠাৎ এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এবার বিকট গর্জনে মুখ থুবড়ে পড়লো পাহাড়ী ড্রাগন—ডক্টর রায়চৌধুরীর পোষা ডাইনোসর।

আর উপায় না দেখে ক্যাপটেন সিং হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়েছেন। ডাইনোসরটার প্রায় শরীরের ওপর এসে ফেটেছে সেই মারাত্মক বিস্ফোরক, প্রকাণ্ড শরীরটা আছড়ে পড়েছে পাথুরে জমিতে।

—ডায়না! ডায়না!

বিদ্যুৎ বেগে গুহার আড়াল থেকে ছুটে এল এক রমণী। পরনে পাহাড়ী আদিবাসীদের মত জংলী পোশাক, হাতে রাইফেল। এতক্ষণ সে গুহার আড়াল থেকে ক্যাপটেন সিংএর দলের সঙ্গে গুলি বিনিময় করছিল। সে দেবীরানী—ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরীর পালিতা কন্যা মিতালী।

দেবীরানী ছুটে গেল ডাইনোসরটার কাছে। ওই বিশাল প্রাগৈতিহাসিক দেহটা একটা পাহাড়ের মত পড়ে আছে ল্যাবরেটারী গুহার সামনের পাথুরে প্রান্তরটায়।

ওর শরীরের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো দেবীরানী।

ওর লম্বাটে মাথার দিকটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিয়ে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে দেবীরানী বললো—ডায়না, ডায়না, দেখ আমি এসেছি। ওরা কাপুরুষের মত রাইফেল আর গ্রেনেড দিয়ে তোকে হত্যা করলো। ওরা বর্বর, ওরা খুনী। ডায়না, ডায়না, আমার দিকে তাকা—জীবনে তো তুই কখনও আমাকে অমান্য করিস নি—তবে কেন চোখ খুলছিস না...?

মানুষের ভাষা দশ কোটি বছর আগের ওই জানোয়ার বুঝলো কিনা জানি না—কিন্তু দেবীরানীর কান্নায় মুমূর্ষু ডাইনোসরটা অতি কষ্টে একবার চোখ খুলে তাকালো, কিছুক্ষণ তাকিয়েই রইলো দেবীরানীর দিকে, তারপর শেষ-বারের মত একবার ডেকে উঠলো—কিন্তু এ তো গর্জন নয়--যেন বুক ভাঙা কান্নার সুর, একান্ত প্রিয়জনকে ছেড়ে চলে যাবার হাহাকার........এরপরই ওর মাথাটা ঢলে পড়লো দেবীরানীর কোলের ওপর।

দেবীরানী শিশুর মত কেঁদে উঠলো ওই প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের মাথা কোলে নিয়ে।

ততক্ষণে ক্যাপটেন সিং দেবীরানীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে তাঁর উদ্যত নিষ্ঠুর রিভলবার।

—ইউ আর আণ্ডার এ্যারেস্ট।

॥ ২৪ ॥

(সদলবলে)

ক্যাপটেন সিং সদলবলে ল্যাবরেটারী গুহার মধ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আমি আর মেঘনাদ।

ওপক্ষের লোকজন যে কজন ছিল একটু আগে লড়াই এ তারা প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আহত—তাই ধরা পড়তে দেরী হল না।

ল্যাবরেটারী গুহার একেবারে প্রান্তে গুহাটা যেখানে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে শেষ হয়ে এসেছে সেখানে লোহার গরাদ দেওয়া বন্দীশালা। তার মধ্যে কয়েকজন স্থানীয় পাহাড়ী আদিবাসীকেউ অর্ধমৃত, কেউ বা মৃতপ্রায়। বিজ্ঞানী রায়চৌধুরীর বিজ্ঞান গবেষণার মানুষ-গিনিপিগ এরা।

তাদেরও গুহার বাইরে নিয়ে আসা হল।

কিন্তু সকল রহস্যের যে মূল নায়ক —সেই বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ রায়-চৌধুরী কোথায় ?

সমস্ত ল্যাবরেটারী গুহা এবং আশ-পাশের অঞ্চলটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তাঁকে পাওয়া গেল না।

সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি অন্তর্ধান করেছেন।

॥ ২৫ ॥

(অভিযানের শেষ)

জীপ ছুটে চলেছিল কাটার রোডের পথ ধরে। শিপকি গিরি উপত্যকা এখন অনেক পেছনে।

জীপের মধ্যে আমরা তিনটি প্রাণী।

স্টিয়ারিং হুইল ক্যাপটেন সিং-এর হাতে।

ক্যাপটেন সিং গল গল করে অনেক কথা বলে যাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রাণে আনন্দের তুফান উঠেছে। শিপকি উপ-ত্যকার বিভীষিকার অবসান ঘটাতে পেরে-ছেন তিনি। মেঘনাদ কিংবা আমাকে ঠিক সময়ে ডেকে এনে কাজে লাগাতে পারার কৃতিত্ব তাঁর কম নয় সুতরাং একটা ভাল রকম সরকারী পুরস্কারের ভাগ্য থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

—তবু একটা বিরাট দুঃখ থেকে গেল মেঘনাদ ভাইয়া—ক্যাপটেন সিং বললেন —দশ কোটি বছর আগের পৃথিবীর অতিকায় ডাইনোসরটা যদি জ্যান্ত ধরতে পারতাম, আজকের পৃথিবীতে এক জীবন্ত বিস্ময় হয়ে থেকে যেতে পারতো। কি রকম হৈ চৈ টা হত ভেবে দেখুন।

ডাইনোসরটার কথা তখন আমিও ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তার মৃত্যু দৃশ্যটার কথা। বিশেষত দেবীরানীর কোলে মাথা রেখে তার ওই অন্তিম চাউনি —তা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না আমি। সে দৃষ্টির মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি প্রিয়জনের কাছ থেকে শেষ বিদায় নেবার বেদনা। কিন্তু এ-ও কি সম্ভব ? দশ কোটি বছর পূর্বের জানোয়ার--তারাও কি ভালবাসা, স্নেহ, প্রীতির কথা জানতো। তবে কি জীবের হৃদয়বৃত্তির জন্ম প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ? একসঙ্গে অনেক কথা ভিড় করছে আমার মনে।

ডাইনোসরটার মৃতদেহ পাঠানো হবে নৃতত্ত্বের গবেষণাগারে। কেটে, ছিঁড়ে দেখা হবে ওর শরীর রহস্য। প্রাচীন জুরাসিক যুগের আরও অনেক অনুদ্ঘাটিত রহস্যই হয়তো জানা যাবে দেবীরানীর প্রিয় 'ডায়নার' অস্থি মজ্জা বিশ্লেষণ করে।

—সমস্ত ব্যাপারটাই পাগলামীর চূড়ান্ত। ক্যাপটেন সিং নিজের মনেই হা হা করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে আবার বললেনঃ বিশেষত আদি-বাসীদের মধ্যে ওঝা সেজে থাকা ওই রমণী 'দেবীরানী' না কি নাম যেন ওর কথাটাই ভাবুন। কথাবার্তা শুনে তো

পেটে বেশ বিদ্যে আছে বলেই মনে হল। অথচ জীবনের সবকিছু ছেড়ে এই দুর্গম জংলী উপত্যকায় খামোখা যত ভুতুড়ে কাণ্ড কারখানা ফেঁদে বসেছিল—একেই বলে মশাই সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

—আপনি ভুল করছেন ক্যাপটেন সিং—

মেঘনাদ এতক্ষণ বাদে মুখ খুললো, —আপনাকে তো সব ব্যাপারটা আগেই বলেছি তবু এটা বুঝছেন না কেন 'দেবী-রানী' যার আসল নাম মিতালী দত্ত, এ জীবনটাই ছিল তার একটা 'মিশন'—সমস্ত জীবনটা সে স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করেছিল তার পিতৃতুল্য বৃদ্ধ বিজ্ঞানী অরবিন্দ রায়-চৌধুরীর গবেষণাকে সফল করার সাধনায়।

—স্ট্রেঞ্জ। ক্যাপটেন সিং প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। ডক্টর অরবিন্দ রায়-চৌধুরীর গবেষণার নামে এই সব অসামাজিক দানবীয় কাণ্ডকারখানা আপনি সমর্থন করেন মেঘনাদ ভাইয়া?

—কে জানে, আপনার এ কথার সঠিক উত্তর আমি হয়তো এক্ষুণি দিতে পারবো না ক্যাপটেন সিং, তবে এটুকু আমি বিশ্বাস করি ডক্টর রায়চৌধুরীর সাধনা যদি সত্যিই সফল হত মনুষ্য জাতির ইতিহাস যেত বদলে এবং এর পুরো কৃতিত্বটুকু বহন করেই তিনি আগামী কালের মানুষের কাছে হয়ে উঠতেন দেবতা —তাঁর সমস্ত অতীত অসামাজিক দানবীয় কাণ্ডকারখানা এ গবেষণার মূলে থাকা সত্ত্বেও। এটাই ইতিহাসের সত্য।

—কি বলছেন আপনি মেঘনাদ ভাইয়া! মেঘনাদের দিকে কয়েক সেকেণ্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ক্যাপটেন সিং কোনক্রমে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

—এ আমার উপলব্ধি ক্যাপটেন। আপনি যথাসময়ে এসে আমাদের উদ্ধার না করলে বৃদ্ধ উন্মাদ বিজ্ঞানী হয়তো আমাদের তাঁর গবেষণার গিনিপিগ বানিয়ে হত্যা করতেন কিন্তু তবু যা উপলব্ধ সত্য তা অস্বীকার করি কি করে?

অবাক হয়ে শুনছিলাম মেঘনাদের কথাগুলো। মন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে।

ল্যাবরেটারী গুহার আশপাশে অনেক খুঁজেও ডক্টর রায়চৌধুরীর কোন সন্ধান পাইনি। মানুষটা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

আমার মন বলছিল বিজ্ঞানী ডক্টর অরবিন্দ রায়চৌধুরী একদিন আবার ফিরে আসবেন কিংবা অন্য কোথাও শুরু করবেন তাঁর অসম্পূর্ণ গবেষণা—এবার হয়তো এক সুস্থ কল্যাণময় পথে।

আমাদের কারুর মুখে কোন কথা নেই।

ক্যাপটেন সিংএর দৃষ্টি সামনের পাহাড়ে ভাঙা চড়াই উৎরাই রাস্তায়। আমি আর মেঘনাদ তাকিয়েছিলাম দূরে —পাইন, আখরোটে জঙ্গল ঘেরা সেই শিপকি উপত্যকার দুর্গম পথে, যার একটু দূরেই শুরু হয়েছে ড্রাগন পাহাড়। কিন্তু আর কোন বৈশাখী অমাবস্যার রাতে সেখান থেকে নেমে আসবে না ড্রাগন দেবতার বাহন—আদিবাসীদের কাছ থেকে জীবন্ত মানুষ অর্ঘ্য নিতে।

আদিবাসীদের ওঝা দেবীরানী আজ সভ্য মানুষের কারাগারে।

ড্রাগন পাহাড়ের রহস্য আজ উদ্‌ঘাটিত।

জীপ ছুটে চলেছে তীব্র গতিতে। সিমলা আসতে আর দেরী নেই।

— সমাপ্ত —



আমার ছোট্ট বন্ধুরা,

শ্রাবণ-ভাদ্র একসঙ্গে বেরুলো। পুজো সংখ্যা এবার দারুণ হচ্ছে। এ সংখ্যায় তোমাদের সবার যোগ দেওয়া চাই।

ভালোবাসা রইল

দাদাভাই

মামার বাড়ির কথা

শুভব্রত ঘোষ বয়স—৭

এবারের গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে যাব—মনে কত আনন্দ। আমাদের মামা বাড়ি যেতে হয় বাসে করে, ৩টা জেলা পেরিয়ে। মেদিনীপুর, হুগলী, বর্ধমান তারপর বাঁকুড়া। মামাদের ২টা পুকুর, আম, জাম, লিচুর বাগান। আম, লিচু খাব, পুকুরে চান করব, আর পড়া-শোনার তাগাদা নেই। সেখানে আমার দাদা আছে। দাদা ওখানেই থাকে। বড় মামা ফরেস্টার। মামা মাঝে ৩দিন বাড়িতে আসেন। বড়মামাকে খুব ভাল লাগে। বড়মামা কত গল্প করে। মাছ ধরে। তারপর মেজোমামা ওরে বাব্বাঃ সবাই ভয় করে। মেজোমামা স্টেশন মাস্টার। বর্ধমানে। রোজই বাড়িতে আসেন। এসেই সবাই কে কি করছে খবর নেবে। তারপরই ডেকে কাজ দেবে। 'চিনে, সারা সকাল গাছে গাছে চড়েছিলি অংক-গুলো হয় নি। দুপুরের মধ্যে সব অংকগুলো করা চাই।'

চিনে হল আমার দাদা, চুনী থেকে চিনে। মামাতো ভাই বোনেরা সকলেই ভয়ে চুপ। আমাকে ডেকে নিয়ে ঘরে খেয়ে দেয়ে কাছে নিয়ে শোবে। বাব্বাঃ, যা নাকের শব্দ, মনে হয় ঝড় উঠছে। কিন্তু মেজোমামা রোজই চকোলেট মিষ্টি নিয়ে আসবে। আমাদের জন্য। আর সেজোমামা বাড়িতে থাকে না। সে নাগাল্যাণ্ডে থাকে। দাদু তো সব সময় বৈঠকখানায় কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত। মাসি-মনিরা মানে বড় মাসিমনি ও ছোট মাসি-মনি দুজনেই চায় কে আমাদের বেশি ভালবাসে। দিদি মানে দিদিমাকে নিয়ে ঘুরবে আর কত কি খেতে দেবে।

আমার খুব লজ্জা করে। কেননা আমি তো বড় হয়েছি। কোলে উঠতে লজ্জা করে। আর আছে ছোটমামা। ছোটমামা বর্ধমানে কাজ করে। রোজ যাওয়া আসা করে। এসেই কাঁধের ব্যাগটা আমাকেই দিয়ে বলবে বুড়ো, প্যাকেটটা খুলে দ্যাখ্ তোর জন্য আনলাম। বলে রাখি আমার ডাক নাম 'বুড়ো'। বেশ আনন্দে ছুটি কেটে গেল। এবার বাড়িতে ফিরে আসতে হবে। মনটা খুব খারাপ লাগ-ছিল তখন।

আমাদের ক্লাব

মধুমঞ্জরী গিরি

বয়স—১০

আমাদের ক্লাবের নাম আইডিয়াল সোসাইটি। আমি ও আমার বোন কৃষ্ণকলি আইডিয়াল সোসাইটি ক্লাবের সদস্য। আমরা স্কুল থেকে এসে খাবার খেয়ে সাড়ে-চারটেয় ক্লাবে যাই। ক্লাবে নাচ, ড্রিল ও জিমন্যাস্টিক্স শেখান হয়।

আমাদের ক্লাবে আমার অনেক বন্ধু আছে। তাদের নাম—নন্দিতা, বেবী, ইরা, সুমন, রথিন, সম্পা, তুলসী, জ্যোৎস্না, লোপা, স্নিগ্ধা ও আরও অনেকে। আমাদের ক্লাবে ছেলে মেয়ে সবাই একসঙ্গে ড্রিল, জিমন্যাস্টিক্স করি। ড্রিল শেষ হলে প্রার্থনা সঙ্গীত হয়ে ক্লাবের কাজ শেষ হয়।

জিমন্যাসটিক্স-এর ড্রেস সাদা গেঞ্জি ও সাদা প্যাণ্ট। প্রতি বৎসর আমাদের ক্লাবে ফাংশান হয়। ১৯৮১ সালের ফাংশানে আমরা যোগ দিয়েছিলাম।

আমি ও বোন ড্রিল, জিমন্যাস্টিক্স করেছিলাম। বোন জিমন্যাস্টিক্স-এ মেডেল পেয়েছিল। বোনলেস্ জিমন্যাস্টিক্সটি ও খুব ভাল পারে। আমাদের ড্রিল শেখান ভোটনদা। জিমন্যাস্টিক্স শেখান অরুণদা, কালিদা ও মাস্টারমশাই। খেলা শেখান—দেবুদা ও রবিদা। নাচ শেখান টিয়াদি। বাঁকুড়ায় যে যুব উৎসব হয়েছিল তাতে আমাদের ক্লাব অংশ নিয়েছিল। সবাই আমাদের ক্লাবের প্রশংসা করে। আমাদের ক্লাবে যে বসন্ত উৎসব হয়েছিল তা রেডিওতে মহিলা-মহলে প্রচার করা হয়েছিল।

ছড়া

সুদেষ্ণা রায় (৭)

এক হাতে ডাস্টার,
এক হাতে চক।
তাই নিয়ে মাস্টার
কাশে খক্ খক্।

পিঁপড়ে পিসি

পুষ্পজিৎ ভট্টাচার্য (৬)

পিঁপড়ে পিসি পিঁপড়ে পিসি
মিছরি পেয়ে
দই সন্দেশ চাও?
রসগোল্লা দেব খেতে
হাসতে হাসতে খাও।

সাধ

মধুমিতা ঘটক (১২)

কলকাতাতে বাড়ি আমার,
সল্ট লেকেতে থাকি।
লবণ হ্রদের ছাত্রী আমি,
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি।
মনে আমার অনেক আশা,
অনেক বড়ো হবো,
লেখা পড়া শেখা হলে
দেশ বিদেশে যাব।

মস্ত রাজা

শুভায়ন বসু (৮)

রাজামশায়ের মস্ত টাক
ঢাকেন পাগড়ি দিয়ে
রাজামশাই যুদ্ধ করেন
মাসির বাড়ি গিয়ে
সব দেশকে লন্ডভন্ড
পরাজিত করে
দেশের কাছে শ্রদ্ধা পেয়ে
ফেরেন রাজা ঘরে।



পরিচালনা —অরুণ সেনগুপ্ত

খুন না আত্মহত্যা

গত ২১শে জুলাই বুধবার তাবিন্দ-নগর বাসস্ট্যান্ডের পিছনে একটি মৃত-দেহ পুলিশ উদ্ধার করে। মৃতের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। অ্যাসিডে মৃতের গলা মুখ পুড়ে গেছে। বিশেষ সূত্রে জানা গেল মৃত্যুটিকে কেউ কেউ আত্ম-হত্যা বলে চালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা খুন করা হয়েছে বলেই মনে করছেন। এলাকায় এর জন্য বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সমীর ও বন্ধুরা বাঁকুড়া

পানিত্রাসে দাতব্য চিকিৎসালয়

এই জেলার পানিত্রাস গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসগৃহে শিশুদের চিকিৎ-সার জন্য সম্প্রতি একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়েছে।

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্র এখানে ওষুধ দেওয়া হয়।

শম্পা রায় হাওড়া

হনুমান ডাকাত ঠেকাতে রক্ষীবাহিনী

এ অঞ্চলে কিছুদিন হল হনুমানের উৎপাতে স্থানীয় অধিবাসীরা অতিষ্ট হয়ে উঠেছেন। সকাল সন্ধ্যে যখন তখন এই ডাকাতেরা লোকের বাড়ি ঢুকে আনাজ জিনিস পত্র নিয়ে পালাচ্ছে। স্টেশনের আনাজ বিক্রেতারাও এদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বিনা বাধায় এদের তাণ্ডব নৃত্য এখন গৃহস্থের ছাদেও আরম্ভ হয়েছে।

শোনা যাচ্ছে অধিবাসীরা মুখ বুজে আর এই অত্যাচার সহ্য করবেন না। প্রতিরোধের জন্য খুব শীঘ্রই হয়ত একটা রক্ষীবাহিনী গড়ে তুলবেন।

সন্দীপ্ত বসু বেলঘরিয়া

কপাল ভালো

রবিবার, ছুটির দিন। তবু ভীড়ের কমতি নেই। রাস্তা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা থাকায় বাস বেশ জোরেই ছুটছে। একটি ১০, বছরের মেয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তার ডান হাতটা জানালা দিয়ে বের করে দিয়েছে। সামনে দাঁড়ানো ভদ্রমহিলা এটা লক্ষ্য করে হাত ভেতরে নেওয়ার জন্য বললেন। কিন্তু বাসের কোলাহল এবং মেয়েটির অন্যমনস্কতার ফলে ভদ্রমহিলার কথা শুনতে পায়নি। ভদ্রমহিলা তখন মেয়েটির হাত টেনে ভেতরে নিয়ে এলেন। আর ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে তীব্র গতিতে একটা লরী একেবারে বাসের গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেল। কপাল ভালো না হলে নিশ্চিত এই রকম দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

শুভ্রা মিত্র বিরাটী

লুকোচুরি

অজিতকুমার বসু

পেয়ারা গাছটির সবুজ পাতার ঘন ঝোপের আড়ালে লুকোচুরি খেলছে চারটি শালিক পাখি।

সেদিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে আসে বিভাসের মন।

বাগানটিতে চারটে শালিক আর বিভাসই শুধু নয়। শুধু নয়; আছে আরও তিনটি ছেলেমেয়ে। তাদের নাম সন্তু, কাজল আর বীণা।

ওরাও চারজনে লুকোচুরি খেলছে বাগানটিতে।

বাড়ির পাচিলের মধ্যেই এই বাগানটি।

ডিসেম্বর মাস। স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফলাফল যা তাতো বোঝা যাবে আর কটি দিন বাদে। খেলা আর বেড়ানো ছাড়া এখন কি কাজই বা আছে ওদের।

শালিকগুলি দেখতে গিয়ে বিভাসের নজর যায় পেয়ারাগুলির দিকে। বিভাস ভাবে; বাঃ! বেশ বড় হয়েছে তো পেয়ারাগুলি!

উদাস বিভাস! মনে পড়ে না তার সঙ্গীরা লুকিয়ে আছে—খুঁজবার পালা তার।

সঙ্গী বলতে তো সন্তু, কাজল আর বীনা।

বেচারী! এই শীতের দিনেও বসন্তের কোকিলের মতো 'কু—কু' ডাক ছেড়েও সাড়া পায়না তারা বিভাসের।

বিভাস তখন কল্পনার স্বর্গে। ভাবছে: লুকোবার পালা এলে এবার সে পেয়ারা গাছেই লুকাবে শালিকগুলির মতো।

ধৈর্য্যে কুলায় আর কতক্ষণ! উঁকি-ঝুঁকি দিতে থাকে কাজল। বাকী দু' জনেরও একই অবস্থা তখন।

উদাস বিভাসকে নজরে আসতেই তিনজনই বেরিয়ে আসে প্রায় একসঙ্গে 'আবা—আবা' দিতে দিতে....

বিভাসের কি আর তখন মনে থাকে খেলার নিয়ম—কানুন। 'আবা' দেওয়া সত্ত্বেও কাজলের পিঠে সজোরে এক চাপড় বসিয়ে দেয় সে ছোঁবার অজুহাতে।

পিঠ জ্বালা করে ওঠে কাজলের। নিজেকে সামলাতে পারেনা সে। পাল্টা ঘুসি বসিয়ে দেয় তাই বিভাসের পিঠে।

হাজার হলেও কাজল মেয়ে বইতো নয়! পাল্টা নেবার পরও নিজেকে সামলাতে পারেনা সে— কেঁদে ফেলে ভ্যাঁক— করে

ফলটা ভালোই হোল। খেলা হোল পণ্ড।

কান্নার আওয়াজে ছুটে এলেন বড়রা। শুরু হোল বিচার। দু'জনের সাক্ষীতে বিভাসের হোল শাস্তি: আর খেলা নয়। হাত-পা ধুয়ে গরম পোষাক পরে নাও এখুনি।

শাস্তিটা তেমন কিছু নয়। মন থেকে মেনে নেওয়া কঠিন তবু এ অবস্থায়। কিন্তু উপায় কি?'

বিভাসের চোখের সামনে বড় বড় পেয়ারাগুলি ভাসছে। কান্না পায় তার। আসেনা তবু কাজলের উপর অভিমানে। আপন মনেই গজগজ করতে থাকে সে কাজলের উদ্দেশ্যে: দু'দিন বাদে নতুন ক্লাশে উঠবেনা; কে তোমায় অঙ্ক দেখিয়ে দেয় দেখবো!

বাকী রইলো তিন। কি আর করবে তারা। খেলা কি আর জমে তখন। শাস্তি-টা বুঝি তাদেরও। ফিরে যায় যে যার ঘরে।

হাত-পা ধুয়ে চোখে-মুখে জল দেয় বিভাস। শান্তির বাকী কাজ, গরম জামা গায়ে দেওয়া, তখনো বাকি। ঘরে যায় বিভাস

বিভাস-কে তার বাবা বললেন; সারাদিনই তো শুধু হৈ-চৈ, গোলমাল, আমাদের কথা কি ভাব একবারও ?"

সবটা না বুঝলেও গোলমালের কথায় বিভাসের অভিমান হয় খুব। জবাব দিতে না পেয়ে রাগ হতে থাকে তার কাজলের উপর। আপনমনে বলে ঃ তুচ্ছ বিষয়ে বকা খাওয়ানোর মজা দেখাবো একদিন।

ভবিষ্যতের কথায় বর্তমানকে তো আর ভুলে থাকা যায় না। টেবিল থেকে টেনে নেয় তাই ছোটদের মাসিক-পত্রের চলতি সংখ্যাটি।

পড়ায় মন বসেনা বিভাসের। বুঝতে পারে সে ঃ সন্তু, বীনার কথাই ভাবছে সে। ওরা এখন কি করছে বিভাসের জানতে ইচ্ছে হয়। মনে পড়ে বিভাসের ঃ একদিন সন্ধ্যায় সন্তুদের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলো সে। এক সঙ্গে সন্ধ্যাবাতি দেবে তাই তৈরী হয়ে বসে আছে তখন সন্তু। বীণা বসেছে চুল বাঁধতে।

সন্তু বলে। "ভাগ্যিস্ আমিও মেয়ে হইনি—তা'হলে কাজ আরও বাড়তো।

সেদিন বন্দনা গান শেষ হতে বাড়ী ফেরে বিভাস। বীণার গানের গলার তারিফ না করে পারেনা সে।

বিভাস ভাবে, বীণার গান শুনতে যাবো একদিন।

গান শুনতে যাবার কথায় মনে পড়ে বিভাসের ঃ বেশী মেলামেশা পছন্দ করেন না বীণার মা ! কাজলদের কথা আলাদা। মা বলেন ঃ এ পাড়ায় কাজলদের সাথেই আমাদের হৃদ্যতা বেশী।

বিভাস ভাবে ঃ কাজলের হয়তো খুবই লেগেছে ! ভুলতো আমারই ! খেলার নিয়ম মানিনি আমি....

কাজলের ব্যথার অনুভূতি বুঝি বাজতে থাকে বিভাসের বুকে।

বই বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায় বিভাস। ভাবতে থাকে ঃ বাবা বাড়ীতে—বেরোনো চলবে না কোথাও।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে বিভাস, অনেকক্ষণ।

এক সময় গুটি গুটি পায়ে হাজির হয় রান্নাঘরে। মা বলেন; "খুব খিদে পেয়েছে তাই না ? যা ঘরে গিয়ে বোস্-যাচ্ছি খাবার নিয়ে।"

মা জল খাবার নিয়ে আসতে বিভাস বলে ঃ "আমায় ক্রিকেট ব্যাট কিনে দেবে একটা—মা ?"

বিভাসের বাবা ঘরে এলেন এমন সময়। জবাব তিনিই দিলেন ঃ "তোমার খেলাধুলার মানে তো মারামারি আর ঝগড়াঝাটি, তার চেয়ে ঘরে বসে থাকাই ভালো।"

বিভাস তাকায় মায়ের দিকে ঃ চুপ করে বসে আছেন মা। বেশ অসহায় বোধ করতে থাকে বিভাস।

জল খাবার খেতে খেতে বিভাস ভাবতে থাকে ঃ বাড়ীর চেয়ে মামাবাড়ী অনেক ভালো। কেউ-ই রাগ করেন না সেখানে। দিদিমা-দাদামশাইয়ের তো তুলনাই হয়না। মামা-মামী পর্যন্ত তাকে কত ভালবাসেন। এই তো গতবার যখন আমি বেড়াতে গিয়েছিলাম মামাবাড়ী, তখন সার্কাস এসেছিলো সেখানে। দি-গ্রেট ইস্টার ন্যাশন্যাল সার্কাস'। কলেজের পাশে কতবড় মাঠ। সার্কাসের লোকেরা

গোটা মাঠ-টাকে ঘিরে দিয়েছে উঁচু টিনের পাঁচিল দিয়ে। চার-চারটে গেট। গেট-গুলি কত রঙিন ছবি দিয়ে সাজানো। বাঘ—সিংহ—ভালুক—হাতি, আরও কত জন্তু-জানোয়ারের ছবি। ঐ সব জন্তু-জানোয়ারেরা খেলা দেখাবে।

মামা ছিলেন সঙ্গে। বিভাসকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বললেন তিনি : কিরে, দেখবি নাকি সার্কাস ?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই কাউণ্টা-রের দিকে এদিকে গেলেন তিনি—কেটে আনলেন টিকিট।

আর বাড়ীতে বল্লে ? বাব্বা !

একটি মামা আমার। দু'জন হলে আরও মজা হত তাই না? মামীমাও খুব ভাল—মামার-ই মতো। বছর দুই আগে একবার আমাকে এক বাক্সো রঙীন পেন্সিল আর ড্রইং বই কিনে দিয়ে বল্লেনঃ আর কিছু চাই কি তোমার।

সে রঙ পেন্সিল ফুরিয়ে গেছে কবে।

মা-কে কত বলি আমায় এক বাক্সো রঙ আর ভালো তুলি কিনে দাওনা মা। আঁকতে শিখেছি এখন।"

মা বলেন ঃ ক্লাসের পড়া করেই কূল পায়না--স্ট্যাণ্ড করলে না হয় বুঝতাম।"

কেন ? এইতো গেলবার, পরীক্ষায় পাশ করেছি শুনে দাদামশাই প্রকাণ্ড এক হাড়ি রসগোল্লা কিনিয়ে আনালেন। সবাই-কে ডেকে বললেনঃ "দাদুভাই পাশ করেছে' তোমরা সবাই এসো—মিষ্টিমুখ করবো একসাথে।"

শুধু কি তাই ? আরও বললেনঃ স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করলে সুন্দর একটা রিষ্ট-ওয়াচ কিনে দেব তোমায়,দাদুভাই।

মামা বললেন, 'ও তো অনেক দূরের ব্যাপার। এবার তোর ক্লাস ফাইভ্, তাই না বিভাস ? আচ্ছা, ফোর্থ-ক্লাশে উঠলে বেশ দামী পেন কিনে দেব তোকে আমি।'

হ্যাঁ—এইবার-ই তো ফোর্থ ক্লাসে উঠবো আমি।

দারুণ....

কটা দিন বাদেই রেজাল্ট বেরোলো বিভাসদের।

স্ট্যাণ্ড করেছে বিভাস।

প্রোগ্রেস-রিপোর্ট হাতে নিয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই বাড়ী ফেরে বিভাস।

মা বুকে টেনে নেন বিভাসকে। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলেন ; তোর মুখ চেয়ে আছি আমরা—খুব খুশী হবেন তোর বাবা !

বিভাস জানতে চায়ঃ বাপী কখন আসবে মা ?

ঠিক সেই মুহূর্তেই এলেন বিভাসের বাবা।

লক্ষ্য করে বিভাসঃ কাগজে মোড়া বেশ বড় একটা কি যেন রয়েছে তার বাবার হাতে।

বাবার হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে বাকী থাকেনা বিভাসের ঃ স্কুল থেকে পাশের খবর পেয়ে ক্রিকেট-ব্যাট কিনে এনেছেন বাবা তার জন্যে।

মহাজীবন থেকে নেয়া

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁরা অসাধারণ তাঁদের কথা নিশ্চই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করে। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। তোমাদের জন্যেও তিনি অনেক লিখে গেছেন। শুনলে তোমরা আরো খুশী হবে যে, তাঁর মনটাও ছিল ঠিক তোমাদের মতই সরল। তোমাদের মতই ছেলেমানুষির তাঁর আর অন্ত ছিল না। তাঁর জীবনের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা আমি এখানে তোমাদের কাছে বলবো। এই ঘটনাতেই তোমরা তাঁর শিশুর মত সরল হৃদয়ের কিছুটা পরিচয় পাবে।

একবার গ্রীষ্মকালে দারুণ গরমে গ্রামের মানুষ সকলেই প্রায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জ্যৈষ্ঠ মাস। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আকাশ থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। শহর নয়—পাড়া গাঁ। তাই বৈদ্যুতিক পাখার কথা সেখানে চিন্তা করাও যায় না। চারদিকে অসহ্য গরম হাওয়া। দুপুর হলে লোকে ঘর থেকে বেরোতেও পারে না। রাত্রেও ঘুম নেই অনেকের চোখে। বিভূতিভূষণের চোখে-ও হয়তো ঘুম নেই। হয়তো কোন নতুন গল্পের প্লট তখন তাঁর মাথার ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

অন্ধকার থম্‌থমে রাত্রি।

হঠাৎ কী যেন খেয়াল হলো। বিছানা থেকে উঠে বসলেন বিভূতিভূষণ। উত্তর-দিকের জানালাটা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকালেন। একটা বড় তেঁতুল গাছ ভর্তি অসংখ্য জোনাকি। মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে তাদের আলো।

ঘরের দরজা খুলে এবার তিনি বাইরে এলেন।

এত রাত্রেও তিনি এগিয়ে গেলেন বাড়ির পিছনের বাঁশ বাগানের দিকে।

কোথাও কেউ নেই। কোথাও কোন শব্দ নেই। মাঝে মাঝে শুধু কয়েকটা নিশাচর পাখির ডাক। আর তার সঙ্গে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক।

অশান্ত বাঁশবন দমকা গরম হাওয়ায় সময় সময় যেন নুয়ে পড়ছে একেবারে মাটির কাছাকছি। মাটিতে ঝরা শুকনো বাঁশপাতা পুরু হয়ে জমে রয়েছে।

বিভূতিভূষণ সেই বাঁশ বাগানের এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর একটা দেশলাই জ্বেলে সেই শুকনো বাঁশপাতায় আগুন ধরিয়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে সারা বাঁশবন সেই আগুনের শিখায় আলো হয়ে উঠলো। মাথার ওপরে বাতাসের একটানা হু হু শব্দ। অশান্ত বাঁশবন যেন দ্বিগুণ উৎসাহে মাটির কাছে আছাড় খেতে লাগলো।

সব মিলিয়ে সে রাত্রে তাঁকে কী যে আনন্দ দিয়েছিল আজ কেমন করে বলবো?

এদিকে গ্রামবাসীরা কারো ঘরে আগুন লেগেছে মনে করে সকলে চারদিক থেকে ছুটে এলো সেখানে।

তারা দেখলো, ছোট্ট একটা দেশ-লাইয়ের কাঠিতে হঠাৎ আলো হয়ে ওঠা বাঁশবাগানটার মতই লেখক বিভূতি-ভূষণের চোখে মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে সেই অশান্ত বাঁশবন ও লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন।

মুরগীর গায়ে দাগ কেন?

তপনকুমার গিরি



রাস্তায় খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল এক মুরগী, দুধের মতো শাদা তার পালক, থাবা দুটি হলদে। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে এক টুকরো কাগজ পেল। ভাবল এটা নিশ্চই একটা চিঠি। এ পথ দিয়ে যাবার সময় রাজা ফেলে গেছেন। চিঠিটা তাঁর কাছে পেঁৗছে দিয়ে আসতে হবে। ভালো করে চান করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে একটি ঝুড়ির মধ্যে চিঠিটা নিয়ে সে রাজবাড়ির দিকে যাত্রা করল। পথে শেয়াল ভাষার সঙ্গে দেখা। সে তার পুরানো বন্ধু। নইলে শেয়াল কি আর মুরগীর ঘাড় মটকে না দিয়ে ছাড়তো? একগাল হেসে শেয়াল বলল, কোথায় চলেছ? মুরগী বলল আমি চলেছি রাজার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি একখানি চিঠি ফেলে গেছেন। আমি সেটা কুড়িয়ে পেয়েছি। চিঠিটা এই ঝুড়ির মধ্যেই নিয়েছি।

—বটে! আমিও সঙ্গে যাবো কি?

—নিশ্চয় নিশ্চয়! তুমিও ঝুড়ির মধ্যে এসো না। আমি তোমায় নিয়ে যাবো।

শেয়াল গুটি সুটি হয়ে ঝুড়ির মধ্যে বসল। মুরগীটি ঝুড়ি মুখে নিয়ে আবার চলতে লাগল।

কিছু দূরে এসে দেখল একটি নদী।

নদী বলল, কেমন আছ মুরগীদিদি? সেবার জলের পোকাগুলো খেয়ে আমার কি উপকারই না করেছিলে। তোমার কথা এখনও আমি ভুলিনি। তা কোথায় যাচ্ছ?

—আমি যাচ্ছি রাজার কাছে। তিনি একটা চিঠি ফেলে গেছেন। সেটি ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছি।

—ওঃ! তোমার উপর ভারী ঈর্ষা হচ্ছে আমার। আমি কোনদিন রাজাকে দেখিনি। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে পারি কি?

নিশ্চয় নিশ্চয়! আমার এই ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে পড়। দেখো শেয়াল ভায়াকে ভিজিয়ে ফেল না, ও আমার বন্ধু।

লাটাইয়ের সুতোর মতো সরু হয়ে গুটিয়ে শেয়ালের পাশে ঝুড়ির মধ্যে উঠল নদীটি। মুরগী চলতে লাগল আবার। ঝুড়িটা বেশ ভারী হয়েছে। তাই আগের মতো ছুটতে পারছিল না। সে খানিক দূরে আসতেই আগুনের সঙ্গে দেখা। আগুন বলল, সুপ্রভাত। সত্যিই তোমার দয়ার কথা ভুলতে পারবো না

কখনও। শুকনো ঘাস খাইয়ে তুমি আমায় বাঁচিয়েছ, নইলে মারা যেতাম। মুরগী বলল, ট্যাক্-ট্যাক্-ট্যাক্। আগুন বলল, কোথায় চলেছ আজ?

—রাজার কাছে যাচ্ছি। তাঁর চিঠিটা পেঁছে দিয়ে আসবো। আগুন বলল, রাজাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি আমার। আমায় তোমার সঙ্গে নাও না। মুরগী বলল বেশ তো ঝুড়ির মধ্যে এসো। সাবধান, দেখো শেয়াল ভায়া যেন পুড়ে না যায় আর নদীটি যেন না শুকোয়। ওরা আমার বন্ধু। আগুন মিটমিট করলো কতক্ষণ। কিন্তু ঝুড়িতে জায়গা নেই। তাই নিভে ছাই হয়ে গেল আগুন। তারপর শেয়াল ও নদীর পাশে ঝুড়ির মধ্যে রইল। সাদা মুরগীটি যাত্রা করলো আবার।

ঝুড়িটি বেশ ভারী হয়েছে। তাই ধীরে ধীরে চলতে লাগল। রাজবাড়িতে পেঁছিল পরদিন। সদর দরজায় এসে আঁচড় কাটতে লাগল সে। রক্ষী বলল কে?—

—টা-টার-ট্যাক্। আমি দয়া, করুন। রাজা মহাশয়ের একখানা চিঠি তাঁর কাছে পেঁছে দিতে এসেছি। রক্ষী বলল, যাও। মুরগীটা সদর দরজাটা পেরিয়ে এলো উঠানে। উঠান পেরিয়ে এলো প্রাসাদের দরজায়। আর এগোতে পারছিল না সে। ভয় হলো—ঘরে ঢুকতে। ঝুঁড়ির ভেতর থেকে বন্ধুরা সাহস দিল তাকে। মাদুরের উপর পা দিয়ে সে ভেতরের দিকে যেতে লাগল। দারোয়ান হাঁকল, কে? মুরগী বলল, মহারাজের একখানা চিঠি নিয়ে এসেছি। দারোয়ান তাকে রাজসিংহসেনের দিকে নিয়ে গেল। মাথায় মুকুট পরে রাজা বসে আছেন সিংহাসনে। তাঁর হাতে রাজদণ্ড। রানীরা বসে আছেন তাঁকে ঘিরে। সভাসদ্‌রাও বসে আছেন। মুরগীর বুক কেঁপে উঠল। এমন সুন্দর জায়গায় এর আগে সে কখনো আসে নি। সে বুঝতে পারল না এবার সে কি করবে। এক এক পা করে থমকে থমকে, সে এগিয়ে গেল। তারপর দুটি পাখা মেলে, মাথা নিচু করে গম্ভীরভাবে রাজাকে অভিনন্দন জানাল টাক্-টাক্ টাক্। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর মুরগী, কি চাও তুমি? সে বলল, আপনার একটা চিঠি কুড়িয়ে পেয়ে এই ঝুড়িতে করে নিয়ে এলাম আপনার কাছে। রাজা বললেন, বাঃ খুব বুদ্ধিমান, নিয়ে এসো তো তোমার চিঠিটা।

ঝুড়ির ভেতর থেকে চঞ্চু নিয়ে টেনে সে চিঠিটা বের করল। ঝুড়ির মধ্যে আর যা রয়েছে, তা দেখাতে সংকোচ হচ্ছিল তার। তাই, সে কাগজের টুকরোটা টেনে বার করে রাজার হাতে দিল। চিঠি দেখে রাজার মুখখানি লাল হয়ে উঠল রাগে। এ কি চিঠি? এক কোণা ভিজে গেছে, এক কোণা গেছে জ্বলে—মাঝখানে শেয়ালের কাদামাখা পায়ের দাগ। রাজা বললেন, একে চিঠি বলবে তুমি? বোকা কোথাকার? কাল তোমার মাংস রান্না করে খাবো। দারোয়ানকে ডাকলেন রাজা। হুকুম দিলেন, একে নিয়ে মুরগীর খোঁয়াড়ে বেঁধে রাখ গে। এই ঝুড়িটিও নাও। মুরগী ট্যাক-ট্যাক্ করলো ভয়ে, কিন্তু তাতে হবে কি? তাকে নিয়ে খোঁয়াড়ে বেঁধে রাখা হল। অপরিচিত এই মুরগীটিকে দেখে রাজার মোরগেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। আর আঁচড়াতে লাগল নখ দিয়ে। শেয়ালটি তক্ষুণি ঝুড়ি থেকে বেড়িয়ে এল। ক্লাক্-ক্লাক্,

কোয়াক—কোয়াক ! একসঙ্গে ডাকতে আরম্ভ করল মোরগেরা। রাজপ্রসাদে শোনা গেল এই ডাক। রাজা-রানী, দাস-দাসী ছুটে এলো সবাই। বলল, চোর-চোর। ধর ঐ সাদা মুরগীটিকে ধর। সাদা মুরগীটি তার ঝুড়িটি মুখে নিয়ে প্রাণপণে ছুটছে। বেচারী হাঁপিয়ে উঠল। রাজাও তাঁর দলবল নিয়ে পেছনে আসছেন। আর একটু হলেই রাজা তাকে ধরে ফেলেছিলেন আর কি। কিন্তু তিনি তার নাগাল পেলেন না। কেন জান? ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়ল নদীটি। রাজা নদী পেরিয়ে যেতে পারলেন না। মুরগীটি তখন নদীর ওপারে। রাজা ডাকলেন নৌকা নিয়ে এস 'তাড়াতাড়ি। আমায় নদী পার করে দাও। কিন্তু নৌকা কোথায়। তাঁর লোকেরা কাঁধে করে তাঁকে ওপারে নিয়ে গেল। মুরগীটি তখন অনেক দূরে চলে গেছে। পেছন ফিরে দেখল সবাই তখনও ছুটে আসছে। টা—ট্যাক—ট্যাক।

মুরগী ছুটল। তার পেছনে আসছে রাজা ও তা'র দলবল। রাজা তার কাছাকাছি এসে পড়েছেন, এমন সময় জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল। সবাই চিৎকার করে উঠলো, উঃ! ধুলো-ছাই না কী চোখে পড়ল, কিছুই যে দেখতে পাচ্ছি না। সাদা মুরগীটা আবার ছুটল। কিন্তু মুরগীটা আর সাদা নেই। তার গায়ে দাগ পড়ে গেছে। তাকে বাঁচাবার জন্য ছাই ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল হঠাৎ। ফলে তার সারা গায়ে ছাই-এর দাগ লেগে গেছে। রাজা ও তাঁর দলবল খোঁজাখুঁজি করল অনেক। কিন্তু মুরগীটি গেল কোথায়? চোখের ছাই মুছে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুরগীটিকে দেখতে পেলেন না তাঁরা। দেখলো একটি ছোট মুরগী রাস্তার ধারে খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার গায়ে ছাই-এর দাগ। জিজ্ঞেস করলো তাকে, একটা সাদা মুরগী দেখছ এদিকে? মুরগীটি নিশ্চিন্ত মনে মাটি আঁচড়াতে লাগল। সেই থেকে যে কোনো মুরগীর গায়ে একটু না একটু ছাইয়ের দাগ থাকে। লক্ষ্য করে দেখো, দেখতে পাবে।



মাম্পি ঘরে ঢুকে বলল, 'জানো কাকু, পাশের বাড়ির মিলিমাসির বিয়ে হলো তো—কি সুন্দর তত্ত্ব পাঠিয়েছে। কত-রকমের সন্দেশ, তার ওপর আবার বিরাট বিরাট লেডিকেনি। কাপড়-চোপড়ই বা কত'—

ছোট কাকা পাম্পি টুম্পিকে একটা ছবির বই দেখাচ্ছিল, কথা শেষ হবার আগেই বলল, 'দাঁড়া দাঁড়া—কি এসেছে বললি ?'

'কি আবার, তত্ত্ব।'

'তার মানে ?'

'বাঃ, তত্ত্ব জানোনা'—মাম্পি ভুরু কোঁচকালো, 'নানা রকমের জিনিস পত্র—খাবার-দাবার'—

'মোটেই না!' কাকু সোজা হয়ে বসল, 'তত্ত্ব মানে হচ্ছে খবর, খাবার নয়। ডিক্‌স্‌নারি খোল—দেখতে পাবি'—

'আহা, সে তো জানিই'—মাম্পি বলল, 'তত্ত্বকথা, মূলতত্ত্ব—এ সব বইয়ে পড়িনি নাকি ?'

পাম্পি বলল, 'কিন্তু তত্ত্ব বলতে তো কুটুমবাড়ির পাঠানো জিনিষ-টিনিষই বোঝায়!'

কাকু বললে, 'এখন তাই দাঁড়িয়ে গেছে অবশ্য।'

টুম্পি বলল, 'কেমন করে এ রকম হলো ?'

'হবে না কেন' —কাকু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আমরা হচ্ছি পেটুক জাত! কুটুমবাড়ির খবর মানে তত্ত্ব জানবার জন্যে লোক পাঠালে তার সঙ্গে কিছু উপহার-টুপহার দেবার রেওয়াজ ছিল—শুধু হাতে তো আর হাজির হওয়া যায় না। আমরা সেই খবরের ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়ে ওই জিনিসপত্র-গুলোকেই তত্ত্ব বলে ধরে নিয়েছি। শুধু কি তাই নাকি, এই যে মাম্পি বলল সন্দেশ—তার মানে কি ?

'সন্দেশের মানেও কি তুমি পালটে দেবে নাকি ?' পাম্পি অবাক হয়ে তাকালো।

'আমি পালটে দিতে যাবো কেন, তোরাই তো পালটেছিস।'

'আমরা পালটেছি ?'

'নিশ্চয়ই। সন্দেশ মানে তো খবর!'

'সন্দেশ মানেও খবর ?' টুম্পার চোখে বিস্ময়।

'হলে আর আমি কি করবো বল'—ছোটকাকু বললে—'এখানেও সেই একই ব্যাপার। খবর নিতে গেলে একটু মিষ্টিমুখ করাবার দরকার হয়—তাই সেই জিনিসটারই মানে হয়ে দাঁড়ালো সন্দেশ। এখন আবার শুধু মিষ্টি নয়, ছানার মিষ্টি—তাও কেবল একরকমের মিষ্টিই হয়ে দাঁড়িয়েছে সন্দেশ। কি রকম মিষ্টি সেটা বোধ হয় তোদের বুঝিয়ে দিতে হবে না ? না জানিস তো চল ভীম নাগের দোকানে'—

(৬৩ পৃষ্ঠায় দেখ)

তোমাদের রবীন্দ্রনাথ

অমিয়কুমার সেন

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা বা ভারতের কবি নন. তিনি বিশ্বকবি। তাঁর লেখা, আঁকা, গান, চিন্তা—তাঁর সারা জীবনের সকল কর্মের অঞ্জলি দান করে গেছেন সমগ্র বিশ্ববাসীকে। যতদিন পৃথিবীতে সভ্যতা থাকবে রবীন্দ্রনাথও ততদিন বেঁচে থাকবেন মানুষের অন্তরে। ২২শে শ্রাবণ কবির মৃত্যুদিন। এস তাঁকেপ্রণাম জানাই।

বাংলা-সাহিত্যের এমন কোন শাখা নেই যা রবীন্দ্রনাথ পুষ্ট করে যাননি। শিশু ভোলানাথের পূজার নৈবেদ্যের ডালিটিও সাজিয়েছেন অসামান্য নিপুণতার সঙ্গে। বাংলার শিশুসাহিত্যও এক আশ্চর্য রূপ পেল তাঁর যাদু হাতের ছোঁয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ বলতেন কি জান ? তোমরা, শিশুরা নাকি দেশের পরমাত্মীয়। শুধু বলতেন না, তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে তোমাদের দেখেছিলেন, ভাবীকালের নতুন মানুষ রূপে। সেইজন্যই তোমাদের পরিপূর্ণভাবে দেখবার জন্য তাঁর বিরাট চিন্তার সঙ্গে তোমাদের শিশুমনের চিন্তার নিবিড় পরিচয় করে নিয়ে দুই চিন্তায় যোগসূত্র বেঁধেছিলেন। তোমাদের আনন্দ, দুঃখ, ব্যথা, বিচিত্র কল্পনা, সাধ, অ্যাড্ভেঞ্চারের চিত্রগুলি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে শিশুর ভাষা দিয়েই রূপায়িত করেছেন। প্রথমেই দেখ, তাঁর অমর লেখনীতে তোমাদের শিশুজীবনের সুরে সেই কল্যাণকর প্রার্থনা—

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।"

প্রার্থনা শেষে তোমাদের নিত্যকার কাজ হবে সকালবেলায় পড়াশুনা করা। হয়ত সারা সকালটাই পড়াশুনা করে তোমরা ক্লান্ত হয়ে গেলে। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের কথাতেই বলেছেন—

"মাগো আমায় ছুটি দিতে বল
সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা,
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করব শুধু পড়া পড়া খেলা।"

কিন্তু ছুটির দিনটি এলে তোমাদের পড়াশুনা, খেলাধুলা কিছুই যেন আর ভালো লাগে না। সেদিন তোমাদের মনের ক্ষুদ্র কল্পনা যেন পরিচিত আবেষ্টনী ছেড়ে কোথায় যেতে চায়—সে যেন কোথায়—কতদূরে—! রবীন্দ্রনাথ তোমাদের মনের এই ভাবটুকু চুরি করে নিয়ে বলছেন—

"আজকে আমি লুকিয়েছি মা,
পুঁথিপত্তর যত, পড়ার কথা আর বোলনা।'

রবীন্দ্রনাথ শিশুর আবদার তুললেন—

"বল্ গো আমায় কোথায় আছে
তেপান্তরের মাঠ।
কোন্ সাগরের তীরে মাগো
কোন্ পাহাড়ের পারে।
কোন্ রাজাদের দেশে মাগো
কোন্ নদীটির ধারে।"

শুধু কি তেপান্তরের মাঠ ? রবীন্দ্র-

নাথ বলেছেন, জানি তোমাদের যেতে ইচ্ছে করে—

"কত নূতন নূতন দেশে
কত গ্রাম কত রাজ্য"

কিন্তু শিশু তোমরা, ছোট তোমরা, সুদূর যাত্রার আকাঙ্খা নিয়ে কেমন করে তোমরা যাবে তোমাদের গণ্ডীর বাইরে ? তাই ভেবেই চলেছ। হঠাৎ দেখলে খেয়া-ঘাটের মাঝি নদী দিয়ে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে। মনের মাঝে জাগে তখন মাঝি হবার বিচিত্র সাধ—কেন ? ঐ যে মাঝি নৌকা বেয়ে যায়, নদীতটের কত অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে সে চলেছে সুদূরের যাত্রী হয়ে। শিশুচিত্তের এমনি ধারা কত-স্বাভাবিক ও সুন্দর মনোভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে উপাদেয় হয়ে রয়েছে। একটু নমুনা দিই—

"দাঁড়িয়ে ছাদের কোণে, দেখেছি এক মনে,
চাঁদের আলো লুটিয়ে,
পড়ে সাদা কাশের বনে—
মা যদি হও রাজি।
বড় হোলে আমি হব খেয়াঘাটের মাঝি।
এ পার ও পার দুই
পারেতেই যাব নৌকা বেয়ে।"

তারপর, শিশুমনের আব এক রঙিন কল্পনার দোলায় দুলে উঠল কবি-চিত্ত। শিশু হয়ত ভাবল মার কাছে সব সময়ই আবদার করে, দেশ-বিদেশে যাবার অনুমতি নেয়, কিন্তু মা যদি বলেন, এই খোকা, তুই দুর্বল, তোর গায়ে নেই জোর, তুই একা, পথে যদি তোর কোন বিপদই ঘটে—তখন ? সে তখন মার মনের এই সন্দেহ মুক্ত করে, মাকে তার বীরত্বের প্রমাণ দেখাতে তাঁকে নিয়েই সে চলবে পথ, পথে ডাকাতদের সঙ্গে হয়ত তার তুমুল যুদ্ধ করতে হবে, যুদ্ধে তাদের হারিয়ে মাকে সগর্বে বলবে—

"কী ভয়ানক লড়াই হোল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়ল, কাটা।
এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে,
ভাবছ খোকা গেলই বুঝি মরে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে,
বলছি এসে লড়াই গেছে থেমে,
তুমি শুনে পালকি থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্ছ আমায় কোলে
বলছ-"ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কী দুর্দশাই হোত তা না হোলে।"

রবীন্দ্রনাথ এমনি করেই তোমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা শুনিয়ে বীর হতে বলেছেন। এত কম কথা নয়, মাকে বাঁচাতে বিপদের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে শিশু-জীবনের দামের দিকে ফিরে তাকাবে না—এত বড় আত্মত্যাগের কথা তোমাদের হৃদয়ের পরতে পরতে গাঁথা হয়ে থাক্—এই রকম সাহসী, মাতৃভক্ত হও তোমরা—রবীন্দ্রনাথের তোমাদের উদ্দেশ্যে এই ত আন্তরিক কামনা।

ডাকাতদের বধ করে, শ্রান্ত ক্লান্ত 'বীর-পুরুষ'-তোমারা মার কোলে গিয়ে বসলে। এই বিশ্রামের মাঝে একটু আনন্দ ও হাস্য-রসের পরিবেশন হলে তোমরা খুব তৃপ্তি পাও, না ? রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে তোমাদের হাসির খোরাকও জুগিয়েছেন।

"ক্ষান্ত বুড়ির দিদি শাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
নুন দিয়ে তারা ছাঁচি পান সাজে
চুণ দেয় তারা ডালনায়।
শাড়িগুলো তারা উনোনে বিছায়
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়।"

খুবই মজার কথা, না ? মজার কথায় তোমাদের সরল লীলাচঞ্চল মন যেমন

আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তেমনি দুঃখের চেতনায় সেই মনের কোণে আবার ব্যথাও জমে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তা জেনেছিলেন বলেই না কবি মনের সেই ব্যথা অপূর্ব ছন্দবন্ধে রূপায়িত করেছেন তিনি—

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতাম কুকুরছানা—
তবে পাছে তোমার পাতে
আমি মুখ দিয়ে যাই ভাতে
তুমি করতে আমায় মানা ?
সত্যি করে বল্
আমায় করিসনে মা ছল্
বলতে আমায় দূর দূর দূর-
কোথা থেকে এল এই কুকুর ?"

মনেপ্রাণে তিনি তোমাদের কতখানি ভালোবেসেছেন, কতখানি নিজের জীবনের আদর্শ দিয়ে তোমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'শান্তিনিকেতন.।'

"ইহাদের করো আশীর্বাদ
ধরায় উঠিছে ফুটি ক্ষুদ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সংবাদ।
এই মুখগুলি হাসি পাছে যায় ভুলি,
পাছে ঘেরে আঁধার প্রসাদ,
ইহাদের কাছে ডেকে
বুকে রেখে কোলে রেখে
তোমরা করগো আশীর্বাদ।"

তিনিও তোমাদের জন্য তাঁর আশীর্বাদ রেখে গেছেন—

"আকাশ হতে রবির পুণ্য আলো
ঊর্ধ্ব হতে ঝরে
দেবে তোমায় পরিপূর্ণ
প্রস্ফুটিত করে।
ধরার রবি সে দীর্ঘকাল
রইবে না এই ভবে,
তবু তাহার আশীর্বাদ ত রবে।"

(৬০ পাতার পর)

কিন্তু ততক্ষণে সন্দেশের চেয়েও শব্দের খেলায় ওদের মন লেগেছে বেশি। টুম্পি বললে, 'কাকু, আরো কিছু বল।' কাকু বললে, 'আমি আর কি বলবো, মাম্পিই তো বলে দিয়েছে।'

'কি বলেছে !'

'কেন, লেডিকেনি !'

'ওর মানেও কি খবর নাকি ?'

কাকু হেসে ফেলল, বললো—'ধ্যাৎ, তা কেন! বলছিলাম লেডিকেনি নামটা হলো কি করে জানিস কি ? ওই বিশেষ ধরনের মিষ্টিটা খুব পছন্দ করতেন লর্ড ক্যানিং-এর স্ত্রী মানে, লেডি ক্যানিং। সেই জন্যে মিষ্টিটার নাম হয়ে গেছে লেডিকেনি।'

'বা রে, আমরাও তো অনেক জিনিস পছন্দ করি—আমাদের নামে তো কোন খাবারের নাম হয় না !' মাম্পির অনুযোগ।

'তোরা আগে বিখ্যাত হ'—কাকু বললে, 'সেরকম হতে পারলে অবশ্য তোরা যে খাবারটা সবচেয়ে ভালবাসিস—মানে ফুচ্কা, তার নামও হয়ত একদিন হয়ে যাবে মাপাটুম্

তিনজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।



সাহিত্যিক বন্ধুটি আমাকে দেখেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলে উঠল, 'আরে পরমা, তুমি এসে গেছ ! বাঁচালে আমাকে। পুজো সংখ্যার জন্যে একটা গল্প লিখে রেখেছি চোখ বুলিয়ে দাও তো একটু—যা অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে আমার লেখায় !' গল্পটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

"পাটের তেলের ব্যবসা করে বিরাট অবস্থা বানিয়েছে রামনাথ। এখন অবশ্য বয়স হয়েছে—নিজে সব জায়গায় ছোটাছুটি করতে পারে না। তা'ছাড়া লেখাপড়াতেও তো অষ্টরম্ভা, জীবনে পাঠশালার দোর মাড়ায় নি। তাই বন্ধু হরনাথের ছেলে শ্যামলালই তার ডান হাত। কোথাও যেতে আসতে তাকেই পাঠায় সে। আসলে শ্যামলালকে আগের দিনই পাঠিয়েছিল ধানবাদ, ফেরার কথা আজ দুপুরে। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল, পূব আকাশে কুড়ি পয়সা ফালি কুমড়োর মত এক টুকরো চাঁদও উঠে গেল কিন্তু শ্যামলালের আর দেখা নেই। অস্থির হয়ে পায়চারি করছে আর টাকে হাত বুলোচ্ছে, বন্ধু হরনাথ এসে হাজির। 'কি ব্যাপার বলো তো'—রামনাথ এগিয়ে এল, 'তোমার ছেলের খবর কি ?' 'বলবো বলেই তো এলাম'—একটা কাগজ এগিয়ে দিল হরনাথ, 'শ্যাম টেলিগ্রাম করেছে—এই দেখো !'

কাগজ হাতে নিয়েই রামনাথের চক্ষু চড়কগাছ। রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, 'ইয়ার্কি পেয়েছে ! তিন দিন বাদে কালীপুজো—আর ও কিনা ফিরবে তার পর ? ব্যবসাপত্তর কি লাটে উঠবে নাকি ?'

হরনাথ যত বোঝাতে চায়, রামনাথ তত জ্বলে উঠে বলে—'বাজে বোক না—ওই শ্যামনাথের জন্যেই আমি গত মাসে বড়দিনের বাজারটা ধরতে পারলাম না ! ওর জন্যে কি আমি দেউলে হয়ে যাবো নাকি ?'

শেষে হরনাথ রাগ করে বলল, 'বলতে এলুম একটা কাজের কথা—দিলে পাঁচ কথা শুনিয়ে ! তোমার না পোষায় শ্যামকে তুমি ছাড়িয়ে দাও।'

একটু ধাতস্থ হয়ে রামনাথ বললে, 'বসো বসো, যেয়ো না। কি জানো—যাট-বাষট্টি বছর বয়স হয়ে গেল তো, মেজাজটা সব সময় ঠিক—

'থামো থামো ! আমার বয়সও তো তার কম হবে না—আজ পঞ্চাশ বছর চাকরি হয়ে গেল। বিয়ে থা করলে এতদিনে সাত গণ্ডা নাতি-নাতনি হয়ে যেত'—

এই পর্যন্ত পড়েই হাসতে হাসতে আমার দম বন্ধ হবার জোগাড়। সাহিত্যিক বন্ধু বললে, 'কি হলো হাসছো যে ?

বললাম, 'আবার সব মারাত্মক ভুল।'

'তাই নাকি ! কোথায় ?'

দেখিয়ে দিলাম গোটা নয়েক। তোমরাও পারবে। পারবে না ?

—পরমা চট্টোপাধ্যায়

হাবুদাদুর বয়েস বুকুনের চারগুণ বেশি। ৩০ বছর বাদে বুকুনের বয়েস দাঁড়াবে দাদুর ঠিক অর্ধেক। ওদের এখন বয়েস কত ? জানা থাকলে পাঠাও।

—ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

(গতমাসের উত্তর পুজোয় পাওয়া যাবে)



—ঃ পরিচালনা ঃ—

পীযূষ রায়

পুরস্কার ও নিয়মাবলী

প্রথম পুরস্কার—কুড়ি টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার—পনেরো টাকা
তৃতীয় পুরস্কার—দশ টাকা

(গ্রাহকদের জন্য)

(১) যারা গ্রাহক নও তারা পুরস্কার পেলে—এ বছরের গ্রাহক চাঁদার জন্য যে টাকা দিতে হবে তার বাকি অংশ পাঠালে তাদের এক বছরের জন্য গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

(২) এ মাসের প্রশ্নগুলির উত্তর এবং সফল প্রতিযোগীদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

(৩) ভাদ্র মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে অতি অবশ্যই উত্তর সাদা কাগজে লিখে পাঠাবে।

(৪) উত্তরপত্রের সঙ্গে প্রবেশ পত্রটি অবশ্যই কেটে পিন করে পাঠাবে।

(৫) একটি প্রবেশপত্রে কেবল মাত্র একজন প্রতিযোগী অংশ নিতে পারবে।

(৬) সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত সকল গ্রাহক ও পাঠক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে।

এ মাসের প্রশ্নমালা

১। কে লিখেছেন ?
(ক) রাজকাহিনী
(খ) আরণ্যক
(গ) Letter Froma A Father to His Daughter.
(ঘ) Hucleberry Finn.

২। কে সৃষ্টি করেছেন ?
(ক) অরণ্যদেব
(খ) টিনটিন্
(গ) সুন্দরবাবু
(ঘ) কিরীটি রায়

৩। কে আবিষ্কার করেছেন ?
(ক) এটম্ বোমা
(খ) উত্তর মেরু

৪। ভারতের সবচেয়ে আয়তনে ছোট রাজ্য কোনটি ?
(ক) নাগাল্যান্ড
(খ) মেঘালয়
(গ) হিমাচল প্রদেশ
(ঘ) সিকিম

৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন সালে আরম্ভ হয়েছিল ?
(ক) 1905 (খ) 1910 (গ) 1914 (ঘ) 1917

৬। মানবদেহে হাড়ের সংখ্যা কয়টি।
(ক) 106, (খ) 206, (গ) 356 (ঘ) 446

৭। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(ক) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
(খ) মতিলাল নেহেরু
(গ) ডাবলু, সি, ব্যানার্জী
(ঘ) নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

৮। এবার বিশ্বকাপে সাংবাদিকদের ভোটে কোন্ খেলোয়াড় সেরা হলেন এবং কত ভোট পেয়েছেন ?

৯। এরপর কবে কোথায় বিশ্বকাপ হতে চলেছে ?

১০। এরা কোন দেশের খেলোয়াড় ?

(ক) ববি চার্লটন

(খ) গার্ডমুলার

(গ) জিকো

(ঘ) কেম্পেস

১১। কোনটি ঠিক ?

(ক) ঘড়ি, গতি, সময় মাপে

(খ) থার্মমিটার উচ্চতা, তাপ মাপে

১২। শূন্যস্থানে vowel বসিয়ে চারটি Word তৈরি কর। H — — R

১৩। ২২ ফুট লম্বা ফিতে দিয়ে সব চেয়ে বেশি জায়গা কি করে ঘিরবে ?

১৪। একটি বর্গক্ষেত্রকে সমান নয়টি বর্গক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে।

(ক) কটি বর্গক্ষেত্রের সবদিকেই বর্গক্ষেত্র থাকবে ?

(খ) কটি বর্গক্ষেত্রের তিনদিকে বর্গক্ষেত্র থাকবে ?

(গ) কটি বর্গক্ষেত্রের দুদিকে বর্গক্ষেত্র থাকবে ?

(ঘ) কটি বর্গক্ষেত্রের একদিকে বর্গক্ষেত্র থাকবে ?

১৫। কে দলের বাইরে ?

(ক) কলম্বো, কিউবা, নেপাল, ভুটান, জাপান।

আষাঢ় সংখ্যার উত্তরমালা

১। (ক) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

(খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

(গ) Reverend Lal Behari De.

(ঘ) William Shakespeare

২। (ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(গ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

(ঘ) সত্যজিৎ রায়

৩। (১) ক

(২) গ

৪। (ক) রোম

(খ) এথেন্স্

(গ) কায়রো

(ঘ) ইসলামাবাদ

৫। (ক) মিশর

(খ) চীন

(গ) বাংলাদেশ

(ঘ) ইংল্যাণ্ড

৬। (ক) ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ

(খ) এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জী

৭। (ক) সত্যজিৎ রায়

(খ) ঋত্বিক ঘটক

৮। (ক) ফুটবলে

(খ) ক্রিকেটে

(গ) সরোদে

(ঘ) নৃত্যে

৯। (ক) ব্রাজিল

(খ) পর্তুগাল

(গ) সোভিয়েট রাশিয়া

(ঘ) পঃ জার্মানী

৯। (খ) ১৯১৫ সালে

১০। (ক) ৩১

(খ) ওড়িয়া

(গ) Q U

১১। (ক) ১৭৯

(খ) ৪৪৫

১২। লম্বদ—পাঁচ টাকা

জাম্বদ—পাঁচ

আষাঢ় সংখ্যার সকল প্রতিযোগীদের নাম—

প্রথম পুরস্কার—
রণদেব গোস্বামী, কলকাতা।

দ্বিতীয় পুরস্কার—
কৌশিক রায়, কলকাতা।

তৃতীয় পুরস্কার—
সন্দীপকুমার ঘোষ, কলকাতা।

প্রবেশপত্র (শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যা)

'বল তো ?' সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা

ঝলমল

১, রাজেন্দ্র দেব রোড

কলিকাতা-৭

নাম————————————

বয়স————————————

ঠিকানা————————————

গ্রাহক নং (গ্রাহকদের জন্য)————————

তাং... .... স্বাক্ষর ————

জার্মান ডিফেন্স কে ঠাণ্ডা মাথায় ধ্বংস করেছে ইতালি

সত্যজিৎ সেনগুপ্ত

ঘরে বসে টেলিভিসনের পর্দায় বিশ্ব-কাপের কয়েকটি ম্যাচ সহ ফাইনাল খেলা দেখার সৌভাগ্য হল অনেকের মত আমারও। ইতালি যোগ্য দল হিসেবেই ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করলো। প্রথমার্ধের খেলা অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রাণ লাগলো। খেলার ফলও ছিল ০—০। আত্মরক্ষার আত্মবিশ্বাস এবং পরিকল্পনা প্রসূত আক্রমণ দিয়ে পশ্চিম জার্মানিকে প্রায় ঠাণ্ডা মাথায় ধ্বংস করে ইতালি দ্বিতীয়ার্ধে যে তিনটি গোল করেছে তা সত্যিই অনবদ্য।

এগারো মিনিটের মাথায় জেন্টিলের সেনটারটি যে ভাবে শূন্যে শরীর ভাসিয়ে হেড দিয়ে পাওলো রোসি ইতালিকে এগিয়ে দিলেন তা ভুলবার নয়। তবে ম্যাচের সেরা গোলটি করেছেন কিন্তু তারদেলি। জার্মান রক্ষণভাগকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে যে তীব্র কাটটি তিনি করেছিলেন সেটি গোলের ভিতর থেকে কুড়িয়ে আনা ছাড়া জার্মান গোলরক্ষকের করার কিছু ছিল না। তৃতীয় গোলটি হল পাওলো রোসির কৃতিত্বেই। তাঁর নিখুঁত সেনটারটি থেকেই আলতোবেলি গোল করলেন ৩—০। এই গোলটির



কিছু পরেই পশ্চিম জার্মানীর ক্রিমির কাছ থেকে বল পেয়ে পল ব্রিটনার একটি গোল শোধ করলেন। গোলটি কিন্তু দর্শনীয়।

এই ভাবে এগিয়েছে

ইতালি

পোল্যানডের সঙ্গে ০—০ ড্র

পেরুর সাঙ্গ ১—১ গোলে ড্র (গোলদাতা গ্রাজিয়ানি)

আরজেনটিনার বিরুদ্ধে ২—১ গোলে ড্র

পেরুর সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র (গোলদাতা তোরিবিও দিয়াজ)

ক্যামেরুনের সঙ্গে ১—১ গোলে ড্র (গোলদাতা গ্রাজিয়ানি)

আরজেনটিনার বিরুদ্ধে ২—১ গোলে জয়ী (গোল করে মারকো তারদেলি ও অ্যানটেনিও কারবিনি)

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ৩—২ গোলে জয়ী (গোলদাতা পাওলো রোসি—হ্যাটট্রিক)

সেমিফাইনালে পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে জয়ী ২—০ গোলে (গোল করে পাওলো রোসি—২)

পশ্চিম জারমানি

আলজিরিয়ার কাছে ১—২ গোলে পরাজিত (গোলদাতা রুমেনিগে)

চিলির বিরুদ্ধে ৪—১ গোলে জয়ী (গোল করে রুমেনিগে—হ্যাটট্রিক ও রিনডার)

অসট্রিয়ার বিরুদ্ধে ১—০ গোলে জয়ী (গোল করে রুবেশ)

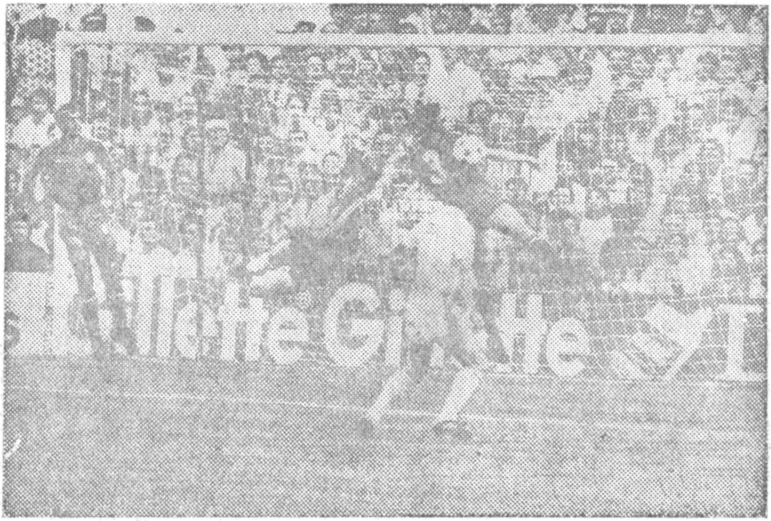
ইংল্যানডের সঙ্গে ০—০ ড্র

স্পেনের বিরুদ্ধে ২—০ গোলে জয়ী (গোল করে লিটবারস্কি ও ফিশার) সেমিফাইনালে ফ্রানসের বিরুদ্ধে ৮—৭ গোলে জয়ী (গোল করে লিটবারস্কি, রুমেনিগে ও ফিশার।

টাইব্রেকার পেনলটি কিকে কারল-হাইনজ-ফরস্টার, বারন ফরস্টার, ব্রিটনর, ফিশার ও রুবেশ)



বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে অনবদ্য ব্যাকভলিতে গোল করছেন পোলাণ্ডের বোনিয়েক।



স্পেনের বিরুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার তীব্র আক্রমণ।



বিশ্বকাপে ব্রাজিল বনাম ইতালি। সক্রেটিস (৮), জিকো (১০)



বিশ্বকাপ বিজয়ী ইতালি দল

পাওলো রোসির উপর আমার প্রচণ্ড আস্থা ছিল

বিয়ারজোত (ম্যানেজার/ইতালি)

বিশ্বকাপে তৃতীয়বার নাম খোদাই করবার জন্য ইতালিকে অপেক্ষা করতে হল ৪৪টি বছর। আমরা এবার বিশ্বকাপ জয় করবোই এমন সংকল্প নিয়ে তৈরী হচ্ছিলাম দিনের পর দিন। সংকল্প ছিল ফুটবলকে নিছক খেলা হিসেবে না দেখে একটি ক্রীড়াসৌলী হিসেবে উপস্থিত করার। এ জন্য ইতালির ফুটবল চরিত্রটি পাল্টানো দরকার ছিল। ফুটবলে যে দুঃসাহসিকতা এবং সৃজনশীলতা আনা সম্ভব এই সত্যটি আমার দলের খেলোয়াড়রা তুলে ধরতে পেরেছেন। ইতালি শুধু আত্মরক্ষা আর প্রতিপক্ষকে আটকে রাখার কাজেই ব্যস্ত থাকুক এমনটা চাইনি আমি। আমার দল আরজেণ্টিনাকে ২—১ গোলে, ব্রেজিলকে ৩—২ গোলে এবং পোলাণ্ডকে ২—১ গোলে হারিয়ে দেওয়ায় আমি ভীষণ তৃপ্তি পেয়েছি। পাওলো রোসির উপর আমার প্রচণ্ড আস্থা ছিল। ছেলেটি ভীষণ চতুর এবং সুযোগ সন্ধানী। তীব্র গতিও আছে। ব্রেজিলের মতন দলের বিরুদ্ধে তিনি তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করা, সেমিফাইনালে পোলাণ্ডর বিরুদ্ধে একাই দুটি গোল এবং ফাইনালে দলের প্রথম গোলটি করে রোসি এখন শিরোনামে। এমন কি টপ স্কোরারের সম্মানও সে অর্জন করলো অথচ এই রোসিই কিনা দু বছর সাসপেণ্ড ছিল।

বিশ্বকাপের হাফ ডজন গপ্পো

শচীন কুণ্ডু

বিশ্বকাপ ফুটবলের যুদ্ধে এমন অনেক অনেক ঘটনা আছে যা কোনদিনই ভুলবার নয়। যেমন ইতালি যেবার প্রথম বিশ্বকাপ জয় করলো সেবারের একটি ঘটনা। রোমে ৫৫ হাজার দর্শকের সামনে ফাইনাল খেলা চলছে ইতালি বনাম চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে। খেলা শেষ হতে মাত্র ৮ মিনিট বাকি। চেক দল এগিয়ে আছে ১ গোলে। গোল শোধের জন্য ইতালি তখন মরিয়া হয়ে খেলছে। ঠিক এসময়ই হঠাৎই একটা দারুণ সুযোগ পেয়ে গেলো ইতালির লেফ্ট উইঙ্গার ওরসি। তিনি তীব্র গতিতে চেকদলের ডিফেন্সে ঢুকেই ডান পায়ে মারলেন এক জোরালো সট, বলটাও বিদ্যুৎ-গতিতে সোয়ারভ করে জালে আছড়ে পড়লো। বিস্ময়ের ঘোর কাটলো যখন তখন চেক গোলকীপার প্লানিকারের কিছুই করার ছিল না। সাইড-লাইনের ধারে বসা ফটোগ্রাফাররাও কম বিস্মিত হন নি। ওরিসি কিন্তু বললেন এ আর এমন কি কাজ। এমন সট আমি যখন তখনই নিতে পারি। আসুন না কাল সকালেই করে দেখিয়ে দেবো। বিশ্বের বাঘা বাঘা ফটোগ্রাফাররা মুভি ক্যামেরা নিয়ে সাত সকালেই মাঠে এলেন। বল নিয়ে ওরিসিও আগের দিনের মতন একই জায়গা থেকে সট নিলেন! হল না। আবার নিলেন, আবারও হল না। এমনি করে ফাঁকা গোলে পর পর ২০ বার সোয়ারভ সট করায় চেষ্টা করেও আগের দিনের মতন আর পারলেন না। ওরিসি লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করে মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফটোগ্রাফাররা সেই করুণ দৃশ্যটাই ক্যামেরাবন্দী করে নিলেন।

১৯৪২ এবং '৪৬-এ বিশ্বযুদ্ধের জন্যই বিশ্বকাপের খেলা হতে পারে নি। হল ১৯৫০-এ। ইতালি এর আগে পর পর দুবার বিশ্বকাপ জিতেছে। আরেকবার জিততে পারলেই জুলরীমে ট্রফি চিরদিনের জন্য পেয়ে যাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তারা নিজেদের তৈরী করছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার এক বছর আগে একটা দারুণ মর্মান্তিক ঘটনায় ইতালি কান্নায় ভেঙে পড়লো। ইতালির স্টার ফুটবলাররা লিসবনের এক টুর্নামেন্টে খেলে বিমানে ফিরছিল সেদিন। খেলোয়াড়রা যখন আনন্দে মশগুল ঠিক তখনি ঘটলো সেই অঘটন। বিমানটা দিক ঠিক না করতে পেরে একটা উঁচু পাহাড়ে মারলো ধাক্কা, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো মুহূর্তেই। দাউদাউ করে জ্বলতে জ্বলতে আছড়ে পড়লো পাহাড়ের বুকে। নিহত হলেন সব খেলোয়াড়ই। এর মধ্যে ইতালির জাতীয় দলের ক্যাপটেন মাজোলা সহ আরো ৭ জনও ছিলেন। ধ্বংস স্তূপ থেকে যখন ওঁদের টেনে বার করা হল সে দৃশ্য তাকিয়ে দেখা যায় না। বীভৎস এই মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৯ এর মে মাসে। ফলে তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্প ভঙ্গ হল ইতালির।

১৯৫০-এর বিশ্বকাপের দায়িত্ব পেয়েছিল ব্রেজিল। বিশাল এই দায়িত্বের কথা মনে রেখেই তারা গা ঝাড়া দিয়ে কাজে নেমে পড়লো। স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরাও সহযোগিতায় এগিয়ে এলো। মারকানা নদীর ধারে বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম দিনে দিনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে লাগলো। তিন তলা উঁচু এই স্টেডিয়ামে ২ লক্ষ দর্শকের খেলা

দেখার মতন ব্যবস্থা করা হল। বিশাল কাজ সন্দেহ নেই। এই স্টেডিয়ামে চতুর্থ বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হল ব্রেজিল বনাম মেক্সিকোর খেলা দিয়ে। জাঁকজমক পূর্ণ উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখার জন্য সবাই উৎসুক। পিল পিল করে মানুষ আসতে লাগলো সকাল থেকেই। এদিকে স্টেডিয়ামের কাজ তখনও কিছু বাকী ছিল। স্টেডিয়ামের চারদিকে মিস্ত্রীদের তৈরী বাঁশের ভারা তখনো খোলা হয়নি। অসংখ্য দর্শক ওতেই উঠে পড়লো তরতর করে। এক সময় হুড়মুড় করে বাঁশের ভারা ভাঙ্গলো। যারা উপরে উঠেছিল তারা পাকা ফলের মত ঝুপ ঝুপ করে খসে পড়লো। আর পড়বি তো পড় মানুষের কাঁধের উপরেই। সে এক হুলস্থুলু কাণ্ডই বটে।

১৯৩০ এ উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল উরুগুয়ে আর আর্জেন্টিনা। কাপ জেতার জন্য দু দেশই একগুঁয়ে। দুটি দেশই একে অপরের প্রতিবেশী। কিন্তু সমর্থকদের মধ্যে যা টেনসন। মারামারি লাগবে নাতো! মজার ব্যপার দেখ, উরুগুয়ে সেমিফাইনালে ৬—১ গোলে যুগোশ্লাভিয়াকে হারিয়েছিল দেখে আর্জেন্টিনাও অপর সেমিফাইনালে আমেরিকাকে ৬—১ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল সেবার। ফাইনালের আগের দিন থেকেই হাজার হাজার আর্জেন্টেনীয় সমর্থক জাহাজে স্টীমারে নৌকায় চড়ে প্লেট নদী পেরিয়ে উরুগুয়েতে আসতে লাগলেন। ব্যাপার-স্যাপার দেখে উরুগুয়ের পুলিশ বাহিনী ও সতর্ক হোল নৌকা স্টীমার জাহাজের যাত্রীদের একে একে সার্চ করা শুরু হল। উদ্দেশ্য কেউ যাতে কোন রকম অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে মাঠে না ঢুকতে পারে। ফাইনালে জিতেছিল কিন্তু উরুগুয়েই।

মেক্সিকোয় ১৯৭০-এর আসরে কর্তৃপক্ষ এমন এক সিদ্ধান্ত নিলেন যা সত্যিই আশ্চর্যজনক। ইন্টারন্যাশনাল টি ভি কর্তৃপক্ষের আবদার ছিল যাতে দিনের আলোতে ভালো ছবি তোলা যায় তার জন্য রোববার আর ফাইনালের খেলা দুপুর দুটোয় করতে হবে। বিস্ময়ের ব্যাপার কর্তৃপক্ষ সত্যি সত্যিই রাজী হয়ে গেলো। দেশ বিদেশের সংবাদপত্রে দারুণ সমালোচনাও গ্রাহ্য করলো না বিশ্বকাপ কর্তৃপক্ষ। প্রচণ্ড গরম আর চড়া রোদের মধ্যেই খেলতে হল খেলোয়াড়দের। সব থেকে অসুবিধা হল শীতপ্রধান দেশ গুলিরই।

১৯৭০ এই ইংলণ্ডের অধিনায়ক ববি মুরের বিরুদ্ধে হীরে চুরির অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে হাজতে পুরে দিয়েছিল। মেক্সিকোর বোগোটা শহরের এক জুয়েলারি দোকানে কেনাকাটা করতে ঢুকেছিলেন ববি মুর আর ববি চার্লটন। তারা যখন দোকান থেকে বেরতে যাবেন ঠিক সেই মুহূর্তেই এক মহিলা সেলসম্যান হীরের নেকলেস চুরি গেছে বলে চেঁচাতে লাগলেন। পুলিশ ডাকা হল। অনেক জেরার পর ববি মুরকে হাজতে পোরা হল। পরদিন কাগজে কাগজে এমন ভাবে লেখা হল যেন মনে হল মুর সত্যিই বুঝি চুরি করেছেন। ববি মুরতো হতবাক! প্রচণ্ড আঘাত পেলেন মনে।' তা সত্বেও জামিনে ছাড়া পেয়ে ইংলণ্ডের হয়ে খেললেন তিনি। এদিকে সেই দোকানের মালিক কিন্তু অভিযোগই প্রমাণ করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত তারাই মামলা তুলে নিতে বাধ্য হলো। মাঝখান থেকে ববি মুরের নামে কলঙ্ক রটলো। কয়েক মাস ধরে পুলিশ আর আদালতে দৌড়াদৌড়ি করতে হল তাঁকে দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে।

বিশ্বকাপের মর্মান্তিক ঘটনা

কৃষ্ণা পাল

৮২র বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলকে দেখা যাবে না এমনটা কল্পনায়ও ভাবেন নি ওঁরা। না ভাবারই কথা, স্পেনের আসরে শুরু থেকেই যে ভাবে ব্রাজিলের এগারোজন ফুটবল যোদ্ধা লড়াই শুরু করেছিলেন তার তুলনা নেই। কিন্তু যা ভাবার নয় তাইতো হল শেষ পর্যন্ত। দারুণ ফেভারিট ব্রাজিল, স্পেন, ফ্রান্স, আর্জেন্টিনার মত দেশও ছিটকে চলে গেল বিশ্বকাপ দখলের লড়াই থেকে।

ফুটবলের লড়াই-এর এই হার জিত নিয়ে কত কান্ডই না এর মধ্যে হয়েছে এবং হবে। সমর্থকদের অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং আবেগের থেকেই যে এসব ঘটনার উৎপত্তি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুশ্চিন্তা হয় তখনি যখন দারুণ সব মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যায়। যেমন এবার ব্রেজিলের রেড-ভি-জেনেরোতে ঘটে গেল যে ঘটনাটা। পাঁচ পাঁচটা তাজা প্রাণ শেষ হয়ে গেল। না, এই প্রাণ দান কিন্তু পরাজয়ের দুঃখে নয়। জয়ের আনন্দে। রাশিয়া আর স্কটল্যান্ডকে পরাস্ত করতেই ব্রেজিলের মানুষ দারুণ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন। বাজী ফটকা ফাটাতে ফাটাতেই এক সময় প্রাণ গেল পাঁচটা। ৪৩ জন বাজীর আগুনেই হাত পা পুড়ে হাসপাতালে গেলেন। কম বেশী আহত হলেন সহস্রাধিক মানুষ।

১৯৩৪ আর '৩৯-এর পর ইতালি আবার বিশ্বকাপ জয় করলো এইতো মাত্র কিছুদিন আগে। জয়ের আনন্দে সারা দেশ এখন মাতোয়ারা শুধু আনন্দ আর আনন্দ! কিন্তু দারুণ দুঃখের দিনও তো গেছে একদিন। মনে পড়ছে সেই ৬৬'র বিশ্বকাপের কথা। টিভিতে খেলা দেখছিলেন নাটালে জিসো নামে এক ইটালিয়ান সমর্থক। সেদিন খেলা চলছিল ইতালি বনাম চিলির মধ্যে। ইতালি গোল দিতেই জিসো আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন একসময়। একটু পরেই কিন্তু জিসো ভয়ে শিউরে উঠলেন যেন। একি চিলি যে গোল খেয়ে আরো তেরে-ফুড়ে এগিয়ে আসছে ইতালির গোলের মুখে। একবার তো আর একটু হলেই গোল হয়ে যাচ্ছিল। হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্যটা সহ্য করতে পারলেন না জিসো। উফ বলেই বুকে হাত দিয়ে যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। এক স্ট্রোকেই শেষ। অথচ সেদিন কিন্তু চিলির আর গোল শোধ করা হয় নি। জিসোর প্রিয় দল ইতালিই জিতেছিল সেদিন।

ইতালির নাটালে জিস্যোর মতই উরুগুয়ের ১৭ বছর বয়সী এক তরুণ সমর্থক দলের পরাজয় সহ্য করতে না পেরে মারা গেছলো ১৯৬২র বিশ্বকাপে। উরুগুয়ে দল যে হোটেলে উঠেছিল সেখানেই বয়ের কাজ করতো ম্যানুয়েল গন্জালেস নামে এক কিশোর। উরুগুয়ের খেলোয়াড়দের সঙ্গে তার দারুণ নিবিড় সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। তার প্রিয় দলের খেলার দিন গন্জালেসও টীমের সঙ্গে মাঠে

যেত। জয়ের পর হোটেলে ফিরতো আনন্দ করতে করতে কিন্তু, যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে যেদিন ৩—১ গোলে হেরে গেল উরুগুয়ে। সেদিনের নিদারুণ শোক সহ্য করতে পারলো না গঞ্জালেস। হঠাৎই হার্টফেল করলো, এই মৃত্যুতে বিচলিত হলেন উরুগুয়ের খেলোয়াড়রাও। ওর কবরে মাটি তুলে দেবার সময় ওঁদের চোখেও জল, শুধু কান্না আর কান্না।

১৯৫৮ আর ৬২'র পর ৬৬'তেও ব্রেজিল বিশ্বকাপ জয় করবে এমন আত্ম-বিশ্বাস নিয়েই ব্রেজিল প্রস্তুত হয়েছিল সেবার। গ্রুপের খেলায় বুলগেরিয়াকে হারিয়ে দিলে কী হবে, হাঙ্গেরি আর পর্তুগালের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল ব্রেজিল। স্বপ্নভঙ্গ হল আর সকলের মতন ব্রেজিলের এক তরুণীরও। সে তখন জাহাজে যাচ্ছিল এক স্থান থেকে আরেক স্থানে। খবরটা শুনতেই শোকে দুঃখে ভেঙ্গে পড়লো মেয়েটি। কী হবে বেঁচে থেকে! ঝাঁপিয়ে পড়লো সমুদ্রের জলে। একটা বিশাল ঢেউ ছিটকে দিল ওকে।

আগের এগারোটি ফাইনালের ফল

১৯৩০—মনটিভিডিওতে (উরুগুয়ে)

উরুগুয়ে—৪ ; আরজেনটিন—২
(ডোরাডো, সী, ইরিয়েট, ক্যাসট্রো) (পেউসেল, স্টাবিল)

১৯৩৪—রোমে

ইতালি—২ চেকোশ্লোভাকিয়া—১
(ওরসি, চিয়াভিও ২) (পাক)

১৯৩৮—প্যারিসে

ইতালি—৪ ; হাঙ্গারি—২
(পিওলা—২, কোলাউসি ২) (টিটকস, সারোসি)

১৯৫০—রিও ডি জেনিরোতে

উরুগুয়ে—২ ; ব্রাজিল—১
(শিয়াফিনো, ঘিগিয়া) (ফ্রিয়াকা)

১৯৫৪—জুরিখে

পশ্চিম জার্মানি—৩ ; হাঙ্গারি—২
(রান—২, মরলক) (পুসকাস, জিবর)

১৯৫৮—স্টকহোমে

ব্রাজিল—৫ ; সুইডেন ২
(ভাভা ২, পেলে—২, জাগালো) (সাইমনসন)

১৯৬২—সানটিয়াগোতে (চিলি)

ব্রাজিল—৩ চেকোশ্লোভাকিয়া—১
(আমারিলডো, জিটো, ভাভা) (ম্যাসেপুটস)

১৯৬৬—লনডনে

ইংল্যানড—৪ ; পঃ জারমানি—২
(হারটস-৩ পিটারস) (হ্যালার, ওয়েবার)

১৯৭০—মেকসিকোয়

ব্রাজিল—৪ ; ইতালি—১
(পেলে, গারসন, জেয়ারজিনহো অ্যালবারটো) (বনিনসেগনা)

১৯৭৪—মিউনিখে

পঃ জারমানি—২ ; হল্যানড—১
(ব্রিটনার, মুলার) (নীসকনস—পেনালটি)

১৯৭৮—আরজেণটিনায়

আরজেনটিনা—৩ হল্যানড—১
(কেমপেস—২, বারতনি) (নানিঙ্গা)

ভারত কি শুধু বিশ্বকাপই দেখবে

দেবাশিস দত্ত

হুজুগে শহর কলকাতা হঠাৎই বিশ্বকাপের সময় ফুটবল জ্বরে তেতে উঠেছিল। অবশ্যই বিশ্বকাপ ফুটবল প্রসঙ্গ আলোচনার সময় মোহনবাগান—ইষ্টবেঙ্গল নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তোমরা অনেকেই ভোর বেলা খবরের কাগজ খুলে বিশ্বকাপের ফলাফল দেখেছ। এবং প্রায় রোজই। হয়ত জিজ্ঞাসু মনে প্রশ্ন জেগেছে, ভারত বিশ্বকাপে খেলায় সুযোগ পায় নি কেন! কবে পাবে? ইত্যাদি।

ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে আসছি—লক্ষ্য ঠিক করে আস্তে আস্তে এগোলেই নাকি গন্তব্যস্থলে পেঁাছান যায়। এবং তার জন্য চাই নিয়মমাফিক কাজ। ফুটবলের জন্য (খেলাধুলায় জন্যও বটে দরকার অনুশীলন। হ্যাঁ, Practice makes a man Perfect. আমার মনে এই মন্তব্যে একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। Perfect Practice makes a man Perfect. শুধু অনুশীলন করলেই হবে না। বিজ্ঞান ভিত্তিক চাই। চাই ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সর্বোপরি নিবিড় অনুশীলন।

ফুটবলে উন্নত প্রতিটি দেশ গত চার বছর ধরে পরিকল্পনা মাফিক আস্তে আস্তে নিজেদের ফুটবলারদের তৈরি করেছে। প্রাথমিক রাউণ্ডের খেলা থেকে হয়ত অনেক দেশই বিদায় নিয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এই সমস্ত দেশগুলির ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাতেই হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল—বিশ্বকাপ ফুটবলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নেই কেন?

ভাবতে খারাপ লাগে এতবড় একটি দেশে এগারজন আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার নেই। না থাকতেই পারে। কিন্তু তৈরি করার কোন মানসিকতা আমাদের নেই। তাই বিদেশী কোন দলের সমর্থক সেজেই এতদিন কেটে গেল।

সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার রাজনীতিই আমাদের আনন্দের ও গর্বের ফুটবলকে ক্রমশই ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে।

এশিয়ান গেমসের জন্য নিজেদের তৈরি করতে উদ্যোগ নিয়েছে এ আই এফ এফ। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুশীলণ শিবিরের মাধ্যমে ভারতীয় ফুটবলাররা প্রস্তুত হচ্ছেন। আদব-কায়দা দেখে মনে হবে সুষ্ঠভাবেই ফুটবলাররা অনুশীলন করছেন। ভারতের ফুটবল চাকা হয়ত অচিরে দ্রুতগতিতে ছুটবে।

দল নির্বাচনে রাজনীতি দেখে অনেকেই এই ধারণা পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন। জাতীয় কোচ নির্বাচন নিয়ে কত যে জলঘোলা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জাতীয় কোচ যাতে একা ক্ষমতা ভোগ করতে না পারেন, তার জন্য পূর্ব জার্মানির কোচ ডেটমার ফিকারকে নিয়ে আসা হয়েছে। হাসিখুশি মজাদার ফিকার পরিস্কার জানিয়েছেন ভারতের জাতীয় কোচ পি কে ব্যানার্জী আধুনিক ফুটবলের সব রকম কলা কৌশলই জানেন।

এশিয়ান গেমসে যোগদান করায়

জন্যও যখন ভারতীয় ফুটবলে দলাদলি, রাজনীতি চলছে তখন আমরা কী করে আশা করব ভারত ভাল ফল করবে ?

সুতরাং, আমাদের হয়ত মোহন-বাগান -ইষ্টবেঙ্গলকে নিয়েই মেতে থাকতে হবে। বিশ্বকাপে যোগ দেওয়ার স্বপ্ন হয়ত কোনদিন বাস্তবে রূপায়িত হবে না।

যদি বাস্তবে রূপায়িত করতে হয়, তাহলে প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। শুধু এ আই এফ এফ-এর কর্মকর্তা বা খেলোয়াড়রা নয়, দর্শকদের ; সংকীর্ণ মানসিকতার গণ্ডি ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে হবে।

প্রথমেই দরকার পরিকল্পনা। ভুল হয়ে গেল, প্রথমে দরকার আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতায় যোগদানের ইচ্ছা। পরিকল্পনার প্রসঙ্গে প্রথমেই একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমে ঠিক করতে হবে কতবছরের মধ্যে আমরা নিজেদের তৈরি করতে পারব। ধরলাম ১৯৮৮ সালে। অর্থাৎ আট বছর পরে। তাহলে প্রথমেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে বার-তের বছরের ছেলেকে বেছে নিয়ে একটি সরকারী প্রশিক্ষণ শিবিরে অনুশীলন করানো দরকার। দলনির্বাচনের সময় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যাতে না ওঠে, সে বিষয়ে ও নজর রাখা দরকার। এই ছেলেদের সব রকম সুযোগ দিয়ে, বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুশীলন, ম্যাচ—প্র্যাকটিস, বিদেশী ফুটবলারদের খেলার ষ্টাইল ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করালে ভাল ফল পেতে বাধ্য।

প্রথমবারেই হয়ত আমরা বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের যোগ্যতা-অর্জন করতে নাও পারি। ভেঙে পড়লে চলবে না। আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যর্থতার সিঁড়ি ভেঙে সাফল্যের দরজায় আঘাত করার জন্য এভাবেই এগোতে হবে তাহলে ভারতও একদিন বিশ্বকাপ ফুট-বলের মত মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করার অধিকার পাবে।

বিশ্বকাপের টুকিটাকি

দ্রুত গোল

এবারের বিশ্বকাপে দ্রুততম গোল করেছে ইংলন্ডের ব্রায়ান রবসন। প্রথম পর্যায়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলা শুরুর ২৭ সেকেন্ডের মধ্যে তিনি গোলটি করেছিলেন।

মোট গোল হোল

বিশ্বকাপে এবার মোট ১৩৯টি গোল হয়েছে। গড়ে প্রতি ম্যাচে ২·৭ গোল। ১৯৭৮-এ প্রতি ম্যাচে গড়ে ২·৬টি গোল হয়েছিল। ফাইনালের চারটি গোল নিয়ে মোট ১৯১টি গোল হল এবার।

টপ স্কোরার

ইতালির পাওলো রোসি ৬টি গোল করে এ সম্মান পেলেন। এর পরেই আছে রুমেনিগের ৫টি গোল। হ্যাট্রিক করেছেন রোসি এবং রুমেনিসে।

একটি ম্যাচে

একটি ম্যাচে বেশি গোল করেছে হাঙ্গেরি, ১০টি। খেলার ফল হাঙ্গেরি ১০,-এল সলভাদোর ১। গোলকিপিং-এ রেকর্ড করেছে ইংলন্ডের পিটার শিলটন। তিনি ৪২৬ মিনিট কোন গোল খাননি।

পেলের প্রথম বিশ্বকাপ

নির্মল কুমার সাহা

অতুলনীয় পেলে, যাঁর পুরো নাম এডসন অ্যারানেটাস ডো ন্যাসিমেন্টো এবার স্পেনের বিশ্বকাপের আসরে হাজির ছিলেন সাংবাদিকের ভূমিকায়। সংবাদ সংগ্রহ করতে এসেও তিনিই ছিলেন বলতে গেলে প্রতিদিনের সংবাদের শিরোনাম। ধন্য, ফুটবল সম্রাট !

আজ থেকে চব্বিশ বছর আগে, ১৯৫৮ সালে, সুইডেনের বিশ্বকাপের আসরে ফুটবল সম্রাট পেলে প্রথম হাজির হন। অবশ্যই খেলোয়াড়ের ভূমিকায়, সেই থেকে পরবর্তী প্রতিটি বিশ্বকাপের সময়ই পেলে সংবাদের মধ্যেই রয়েছেন, এবং বলাই যায়, ভবিষ্যতেও থাকবেন।

সেই ১৯৫৮ সালে, পেলের বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। পেলের দেশ ব্রাজিলের সঙ্গে সেবার প্রাথমিক গ্রুপে ছিল রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া। প্রথম খেলায় অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পেলে ছিলেন না। ব্রাজিল ৩—০ গোলে জিতেছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও পেলেকে মাঠে নামানো হয় নি। ফলাফল ছিল গোলশূন্য। গ্রুপের শেষ ম্যাচে কোচ আর ঝুঁকি নেন নি। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পেলে তাঁর জীবনের প্রথম বিশ্বকাপে খেলতে নামেন।

প্রথম ম্যাচে, প্রথম দু'মিনিটেই পেলে জানিয়ে দেন—তিনি এসে গেছেন! দুটো গোলার মত শট ক্রশ-পিসে নিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। বাকী ৮৮ মিনিট স্টেডিয়ামের সকল দর্শকের দৃষ্টি তাঁর দিকে রাখতে বাধ্য করেছিলেন পেলে। ব্রাজিল জেতে ২—০ গোলে।

পরের ম্যাচ, কোয়ার্টার ফাইনাল। প্রতিপক্ষে ওয়েলস। ওয়েলসের গোলকীপার জ্যাক কেলসি শুরুতেই পেলের একটি ঘুরন্ত শট আটকে জানিয়ে দিলেন তাঁকে হার মানানো কষ্টের। পেলে বনাম জ্যাকের লড়াই জমে উঠল। অবশেষে সত্তর মিনিটের মাথায় হার মানলেন জ্যাক। ডিডির কাছ থেকে বক্সের মাথায় বল পান পেলে। সামনে ছিলেন ওয়েলসের ব্যাক উইলিয়ামস। বুদ্ধিদীপ্ত ও জোরালো শটটি উইলিয়ামসের গোড়ালিতে ধাক্কা খেয়ে গোলে ঢোকে। বিশ্বকাপে পেলের প্রথম গোল। ঐ গোলেই ব্রাজিল সেমিফাইনালে ওঠে। পেলে হল সংবাদের শিরোনাম।

সেমিফাইনালে ব্রাজিল ৫—২ গোলে নাস্তানাবুদ করল ফ্রান্সকে। তিনটি গোল করে সংবাদের মধ্যেই রইলেন পেলে।

এবার ফাইনালে। প্রতিপক্ষে সুইডেন। ২৯ জুন, মুখোমুখি হল দুই দল, দুই দেশ। নিজেদের দেশের মাটিতে প্রবল সমর্থন নিয়ে খেলতে নামল সুইডেন। ব্রাজিলের তারকাদের শুনতে হল নানা বিদ্রূপ। চার মিনিটে সুইডেন এগিয়ে গেল অধিনায়ক লাইডহামের গোলে। সমর্থকরা আরও জাগ্রত হলেন। চার মিনিট পরই ভাভা সুইডেনকে দমিয়ে ১—১ করলেন। বত্রিশ মিনিটে ভাভা

সুইডেন সমর্থকদের উচ্ছ্বাসকে প্রায় স্তব্ধ করে ২—১ করলেন।

পঞ্চান্ন মিনিটে পেলের অসাধারণ গোল। স্যান্টোস সুইডেনের গোল সীমানায় বল ফেলেন। সুইডেনের একাধিক খেলোয়াড়ের মাঝে মিশে ছিলেন পেলে। বলটি ড্রপ খেয়ে খানিকটা উপরে ওঠে। পেলে ডান পায়ের হাঁটু দিয়ে বল টেনে বাঁ হাঁটু দিয়ে মাথার উপরে নিয়েই হেড করেন। বলটি গিয়ে সামনে পড়ার আগেই তিনি ঘুরে গিয়ে চলতি বলে ভলি মারলেন। সুইডেনের গোলকীপার সভেনশনের জাল থেকে বল বের করা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না।

উনসত্তর মিনিটে জাগালো ব্রাজিলের চতুর্থ গোল করার পর আশি মিনিটে সাইমনসন একটি গোল শোধ করলেন।

ব্রাজিলের পক্ষে আবার একটি অসাধারণ গোল করেন পেলে। দুরূহ কোণ থেকে হেডের সাহায্যে অসাধারণ গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ বাঁশি বাজে। ব্রাজিল ৫—২ গোলে জেতে। বিশ্বকাপ প্রথমবারের জন্য ব্রাজিলের ঘরে ওঠে। পেলের ব্রাজিল তারপর ১৯৬২ ও ৭০ সালে আবার বিশ্বকাপ জিতেছে। এবং চিরতরে জুলেরিমে কাপকে নিয়ে গেছেন নিজের দেশে। তবুও, পেলে বলেছেন, ৫৮ সালের বিশ্বকাপের স্মৃতিই তাঁর কাছে সবচেয়ে মধুর স্মৃতি।

খেলাধুলার প্রশ্ন উত্তর

শচীন শঙ্কর

প্রশ্ন : ইংলণ্ডের ক্যাপটেন কেভিন কীগান এবার একটি ম্যাচেও খেললেন না কেন? —জয়দীপ মিশ্র, বেহালা।

উত্তর : বিশ্বকাপে ইংলণ্ড এবার পাঁচটি ম্যাচ খেলেছে। পাঁচটিই ড্র। স্পেনের সঙ্গে শেষ ম্যাচে কীগান খেলেছিলেন। অবশ্য আগের চারটি ম্যাচে প্রচণ্ড পিঠের ব্যথার জন্যই তিনি খেলতে পারেন নি।

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল—কুমারটুলির মতন মহমেডান—ক্যাল : জিমখানার ম্যাচের দিনও দেখলাম দু একজন কর্মকর্তাদের প্রচণ্ড তৎপরতা আর তার কিছু পরেই দারুণ প্রয়োজনীয় গোলটি হল। এসব কি হচ্ছে আপনারা এর বিরুদ্ধে লিখছেন না কেন? —যিশু রায়, বরুণ চ্যাটার্জী, আগরপাড়া।

উত্তর : বলতে দ্বিধা নেই। কলকাতার ফুটবল এখন প্রহসনে পরিণত হচ্ছে। এর ফলে তরুণ ও উদিয়মান ফুটবলাররা ভীষণ ভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হচ্ছেন এবং হবেন। এইসব প্রহসনের কথা আমরা সাংবাদিকরা অনেকবার লিখেছি এবং লিখবোও। কিন্তু যাদের সচেতন হবার কথা তারা যদি কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে আর কী করা।

প্রশ্ন : খেলার মাঠে এখনও গণ্ডোগোল হচ্ছে। ঢিল পড়ছে। রক্ত ঝরছে। ১৯৮০-র সেই মর্মান্তিক ঘটনার পরও কি আমাদের শিক্ষা হবে না? —জয়ন্তী ও সুশান্ত দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ি।

উত্তর : যদি শিক্ষা হোত তাহলে ঢিল পড়তো না রক্তও ঝরতো না। বিস্ময়কর ব্যাপার হল সদস্য গ্যালারী থেকেই এবার গন্ডোগোল হচ্ছে। মাঠে ঢিল পড়ছে। ৬০ পয়সার গ্যালারীর দর্শকরা এবার যেন অনেক শান্ত। বড় ক্লাবের সদস্যদের এ ব্যাপারে চিন্তা করা উচিৎ। তাঁদের আচরণের সঙ্গে ঐতিহ্যশালী ক্লাবের সুনাম দুর্নামের সম্পর্ক যখন জড়িয়ে আছে।

মন্তব্য.... মন্তব্য.... মন্তব্য....

সবই গোলমাল হয়ে গেল। আমি সব ভুল করে ফেলেছি। এর কোন কৈফিয়ৎ নেই। স্নায়ুর চাপে ভেঙ্গে পড়ে ব্রেজিলের বাতিস্তাকে সেদিন বিশ্রী ভাবে ফাউল করে ফেলেছিলাম। আমাকে মাঠ থেকে বের করে রেফারী ঠিকই করেছিলেন। ওই শাস্তি এবং দর্শকদের ধিক্কারই আমার প্রাপ্য ছিল। —দিয়াগো মারদোনা।

আমি যেদিন যুগোশ্লাভ দলের হয়ে বিশ্বকাপ খেলতে গেলাম সেদিন দেশবাসীর কাছ থেকে কতই না সম্বর্ধনা পেলাম। আর আমাকে বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে হেরে দেশে ফিরতেই টিটকারী আর বিক্ষোভের টাও ওঁরা ভেঙ্গে চুড়ে দিল। স্যাফেট ঘুসিক।

এবারের বিশ্বকাপে ব্রেজিল ছিল শ্রেষ্ঠ দল। কীভাবে বিশ্বাস করি সেই দলটিই ফাইনালে খেলবে না।

—ব্রেজিলের পরাজয়ের পর পেলের মন্তব্য

কোনরসের দৃঢ় সংকলপকে আমি শ্রদ্ধা করি। সে চমৎকার সারভ করেছে। বিশেষ করে শেষ দুটি সেটে। আমি বুঝতে পারছিলাম সে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে দমিয়ে দিতে চাইছে। সত্যি বলতে কি কোনরস এবং বিয়র্ন বর্গ এই দুজনই শুধু আমাকে তাতিয়ে দিতে পারে। —উইমবলডন ফাইনালের পর



পূজো আসছে

ঝলমল সাজছে

তোমাদের মনের মত করে আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহেই ঝলমল পুজো সংখ্যা বেরুচ্ছে।

এবার ঃ—

তিনটি বড় উপন্যাস, লিখেছেন—শক্তিপদ রাজগুরু, স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ছটি বড় গল্প, লিখেছেন—অদ্রীশ বর্ধন, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আশাপূর্ণা দেবী, ক্ষণারঞ্জন বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামলী বসু।

অজস্র গল্প ও ছড়া, লিখেছেন—লীলা মজুমদার, শিশির মজুমদার, ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন ভাদুড়ী, সাধনা মুখোপাধ্যায়, আনন্দ বাগচী, অমিতাভ চৌধুরী, বিশ্বরূপ মণ্ডল, রবিদাস সাহা রায়, মহাশ্বেতা দেবী বরেণ গঙ্গোপাধ্যায়, হীরেণ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র লাল ধর, আশা দেবী, জ্যোতিভূষণ চাকী কুমারেশ ঘোষ ও আরও অনেকে।

এ ছাড়াও থাকছে পরমা চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক বন্ধুর মজার মজার ধাঁধা, খেলাধূলার আসর, নিয়মিত সব বিভাগ ও দুধর্ষ ছবিতে গল্প।

নিজের ছোটবেলার কথা লিখেছেন—মন্মথ রায়।

Postal Reg. No. WB/EC-166 JHALMAL Sraban-Bhadra
N.P. Reg. No. RN 32832/78 1389

